Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গম্ভীরা গান পরিবেশনায় উচ্চবর্গের মতাদর্শিক আধিপত্য ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আলীম আল রাজী
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.5
Pages	৮৯-১৩৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গম্ভীরা গান পরিবেশনায় উচ্চবর্গের মতাদর্শিক আধিপত্য ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ

আলীম আল রাজী*

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী অভিনয় শিল্প হিসেবে গম্ভীরা গান পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নিছক বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কখনো কখনো সমাজের অবিচার, অনাচার, অন্যায্যতার বিরুদ্ধেও গম্ভীরা গান প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সময় বিশেষে নিম্নবর্গ গম্ভীরা গানকে ব্যবহার করে উচ্চবর্গের নিকট থেকে সুবিধা আদায় করে থাকে। তখনই গম্ভীরা গান উচ্চবর্গের মতাদর্শ প্রকাশের আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। গম্ভীরা গান শুধুমাত্র নিম্নবর্গের প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না বরং উচ্চবর্গের মতাদর্শ প্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এর ফলে, নিম্নবর্গ তাদের অধিকার সংরক্ষণে যেমন বিচিত্র প্রতিরোধমূলক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তেমনি উচ্চবর্গও তাদের মতাদর্শ ও প্রভাব টিকিয়ে রাখতে রচনা করে চলে নানান ধরনের হেজিমনি কৌশল। এই প্রবন্ধে রনজিৎ গুহ'র সাবলটার্ন স্টাডিজ তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য জেমস সি. স্কটের *Everyday forms of resistance* (1985) গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণে মিশেল ফুকোর 'ক্ষমতা-জ্ঞান' ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। মিশেল ফুকোর 'Normalization' ধারণা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কার্যকর এবং গম্ভীরা গানের কুশলীরা কেমন করে উচ্চবর্গের ক্রীড়নকে পরিণত হয় তা এই প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে যে সকল ঐতিহ্যবাহী ধর্মনিরপেক্ষ অভিনয় শিল্পের (Performing Art) প্রচলন রয়েছে সেগুলোর মধ্যে গম্ভীরা গান সর্বপ্রধান। গম্ভীরা গান শুধুমাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলেই নয়, সমগ্র দেশব্যাপী এই গানের যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের জন্য

* সিনিয়র কনসালট্যান্ট, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড কমিউনিকেশন (সিআরসি), উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

গম্ভীরা গান একটি জনপ্রিয় মাধ্যম বলে বিবেচিত। ধর্মোৎসব থেকে গম্ভীরার উৎপত্তি হলেও বর্তমানে ধর্মের পরাকাষ্ঠা পেরিয়ে তা রূপ নিয়েছে সর্বজনগ্রাহ্য একটি ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে। সামাজিক শিক্ষা ও তথ্য বিতরণের একটি জোরালো লোকমাধ্যম হিসেবে গম্ভীরা গান বিশেষ কোনো ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও বৎসরের যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সাধারণত বিশেষ কোনো ব্যক্তির আগমন বা দিবস উদযাপন উপলক্ষে, কোনো তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণায় গম্ভীরা গানের বিপুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ গানের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের কারণে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবেও বিচিত্রতা ধরা পড়ে। উচ্চবর্গের মতাদর্শগত প্রভাব এবং নিম্নবর্গের টিকে থাকার লড়াইজনিত প্রতিরোধের বিষয়গুলো পরোক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। গম্ভীরা শিল্পীদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশে প্রাত্যহিক জীবন অনুসন্ধান করলেই তাঁদের নীরব এবং অদৃশ্য লড়াইয়ের ক্ষেত্র উপলব্ধি করা যায়।

গম্ভীরা গানে সারা বছরের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সমস্যা, অভাব-অভিযোগ স্থান পায়। এ গানের মাধ্যমে সমাজের সামন্তবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে নানা-নাতি চরিত্রে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে 'ব্রিটিশ তাড়াও' আন্দোলনে গম্ভীরার উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। শিল্পীরা এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সামগ্রিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরতেন বলিষ্ঠতার সাথে। এ সময় গম্ভীরা গান হয়ে ওঠে বর্ষ-বিবরণীর উপস্থাপনার পরিবর্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার। গম্ভীরা গানে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো স্থান পায়। এই গানের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মনে সামাজিক সমস্যাসমূহের ব্যাপারে নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়। ফলে, গম্ভীরা গানকে ক্রমাগত সামাজিক অসামঞ্জস্য, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে, খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ সকল গান সমাজের প্রভাবশালী উচ্চবর্গের সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হয়ে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আলকাপ ও গম্ভীরা গান শুধু উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধেই নয় বরং কখনও কখনও উচ্চবর্গের মতামত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, নিম্নবর্গ গম্ভীরা গানের মাধ্যমে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ করে না, বরং কখনও কখনও তারা উচ্চবর্গের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সুবিধা আদায় করে নেয়। যেহেতু, গম্ভীরা গানের কলাকুশলীরা অনেক সময় এসকল শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে গান পরিবেশন করেন, সেহেতু এ গান পরিবেশনা উচ্চবর্গের মত প্রকাশের ক্ষেত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ক্ষমতার সম্পর্ক অনুসারে সামন্তশ্রেণির আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিকল্পে নির্মিত মার্কসীয় তত্ত্বে 'শোষক' ও 'শোষিতে'র বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক ক্ষমতার সম্পর্কের সরল ব্যাখ্যা করা হয়। এই

বিন্যাসকে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি বা 'উচ্চবর্গ', অপর মেরুতে যারা অধীন 'সাবলটার্ন' শ্রেণি বা 'নিম্নবর্গ'। তিনি বলেন, প্রভুত্ব আরোপকারী উচ্চবর্গ কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা হেজিমনি (পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০০১ : ৩)। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব কিংবা অধীনতার সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক। ফলে, পরনির্ভরতার মধ্যেও নিম্নবর্গের চেতনা উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত থাকে (পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০০১ : ৪)। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণে রনজিৎ গুহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, নিম্নবর্গের মধ্যে যারা সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে অন্যদের তুলনায় একটু উঁচু পর্যায়ের যেমন – নির্বিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষক, তারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের সামাজিক সত্তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ না করে উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে (Ranajit Guha, ১৯৮২ : ৮)। গম্ভীরা গানের সাথে সম্পৃক্ত এই জটিল শ্রেণিদ্বন্দ্বের আবর্তে যেমন একদিকে তৈরি হয় নিম্নবর্গের অধিকার রক্ষার বৈচিত্র্যময় কৌশল তেমনি অন্যদিকে উচ্চবর্গ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে রচনা করে চলে বিচিত্রতর হেজিমনি (Antonio Gramsci, ২০০৩ : ১২)। এই গবেষণায় নিম্নবর্গ সম্পর্কিত উল্লিখিত তত্ত্বের ভিত্তিতে গম্ভীরা গান পরিবেশনায় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন ও অনুসন্ধান করা হয়েছে, যেমন গম্ভীরা গান কি শুধুই উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের ক্রমাগত প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়? যদি প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে নিম্নবর্গের অধিকার কীভাবে রক্ষিত হয়? নাকি গম্ভীরা গান কখনও কখনও উচ্চবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণেও ব্যবহৃত হয়? কীভাবে ব্যবহৃত হয়? গম্ভীরা গানের কুশীলবরা কোন শ্রেণির? তারা কীভাবে পক্ষ বদলায়?

চিরাচরিত বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার একটি রীতি 'গম্ভীরা' গান বা সংগীত হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য হিসেবে এই গবেষণায় আখ্যায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক সেলিম আল দীনের শিল্পদর্শন অনেকটাই বিবেচ্য পাথেয় হিসেবে নির্দিষ্ট। তিনি গম্ভীরা গানকে বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন (সেলিম আল দীন, ১৯৯৬ : ১৭)। গম্ভীরাকে তিনি সরাসরিভাবে 'শিব বিষয়ক নাট্য' হিসেবে উল্লেখ করেছেন (সেলিম আল দীন, ১৯৯৬ : ১৭)। গম্ভীরা গানে যে অংশটুকু সংগীত হিসেবে বিবেচিত হয় সে অংশেও বর্ণনাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে, যা অভিনয়মূলক। গম্ভীরা গান গীতপ্রধান হলেও এর পরিবেশনা রীতি, গীত ও নৃত্য সহযোগে রূপসজ্জার বিচিত্র আয়োজন আমাদেরকে গম্ভীরা গানকে 'নাট্য' হিসেবেই দেখতে ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল (চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ) এবং ভারতের মালদহ অঞ্চলের গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানের কয়েকটি অংশ রয়েছে,

যেমন– মুখপাদ, বন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ার (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪৩-৪৪), পালাবন্দি গান, খবর বা রিপোর্ট। কিন্তু বাংলাদেশের অংশে শুধুমাত্র বন্দনা ও ডুয়েট অংশ নানা-নাতি চরিত্রে পরিবেশিত হয়। গম্ভীরা গানের সুরবৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রদ্যোত ঘোষ বলেন, মাত্র সাত আট দশক আগে এই বিশিষ্ট সুরের জন্ম। তার আগে কেবল শিবকে উদ্দেশ্য করে গান গাওয়া হত। তাতে সুরের বৈচিত্র্য ছিল না। তিনিও গম্ভীরা গানকে 'নাট্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪৫)। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে 'গম্ভীরা গান' একটি স্বতন্ত্র ধারার ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যরীতি হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান বলা যায়।

প্রচলিত সনাতনপন্থীদের রেওয়াজ অনুসারে চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন থেকে শুরু করে পরবর্তী আষাঢ় মাস পর্যন্ত গম্ভীরা গান গাওয়া হতো মণ্ডপে মণ্ডপে। পল্লব সেনগুপ্তের মতে, "গম্ভীরা চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন আগে থেকেই সচরাচর শুরু হলেও বছরের অন্যান্য সময়ও এ উৎসব পালনের খবর পাওয়া যায়। পূর্বে গম্ভীরা উৎসবকে কেন্দ্র করে জলভরা, ছোট তামাশা (একপায়ে লাফিয়ে শিব-বন্দনা), মুখোশ পরে বড় তামাশার মশাল নৃত্য 'মাশান'সহ বিভিন্ন আচরণগত দিক পালন করা হত"(মোমেন চৌধুরী, ২০০৮ : ৭০)। আগত সালকে বরণ এবং বিগত বছরের দুঃখ-দুর্দশার পুনরুক্তি বন্ধের উদ্দেশ্যে শিবকে সামনে রেখে পুরো বৈশাখ মাসব্যাপী কঠোর সমালোচনামূলক গম্ভীরা গান করা হতো। গায়েনরা সমাজের সুখ-দুঃখের চিত্র সকলের কাছে তুলে ধরতেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল, যেমন – মুখপাদ, বন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ার, পালাবন্দি গান, খবর বা রিপোর্ট। মুখপাদে চরিত্রগুলো এক একটি গান করে এসে তাদের পরিচয় প্রদান করতেন। মুখপাদ-এর আবার দুটি অংশ: ১. ধুয়া এবং ২. চিতানি। ধুয়ার আড়াই ফের গান। চিতানি অংশে আছে দুই ফের গান (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪০)। গম্ভীরা গানে বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে প্রদ্যোত ঘোষ উল্লেখ করেন,

> গম্ভীরা গানে প্রথমে ঢোলক ও জুড়ি কেবল মাত্র সম্বল ছিল। আনুমানিক বছর আশি আগে থেকে গোপাল দাস (দাস গোপাল নামে পরিচিত), হরিমোহন কুণ্ডু, শরৎদাস ও মোহম্মদ সূফীর আমলে হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলার প্রচলন হয়। বাঁশীর প্রবেশ হাল আমলের অর্থাৎ প্রায় বছর চল্লিশ আগে থেকে। গানের আসর আয়োজন সম্পর্কে তিনি বলেন, গম্ভীরা ঘরের অর্থাৎ পূজাগৃহের দিকে মুখ করে গায়কেরা ও পাত্র-পাত্রীরা থাকতেন। পাত্র-পাত্রীদের দক্ষিণ দিকে থাকতেন যন্ত্র-সঙ্গীতশিল্পী ও দোহারদের দল। দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদলের মধ্যে হারমোনিয়াম ১ জন, জুড়ি ২/৩ জন, ডুগি-তবলা ১ জন, দোহার ২-৭ জন, বাঁশী ১ জন ছিল উল্লেখযোগ্য (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪০)।

বন্দনা অংশে মহাদেব সেজে একজন আসতেন। পরিধানে বাঘছাল, ডান হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ও বাঁহাতে ডম্বরু ব্যবহার করতেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে দেশের

নানা দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করা ও প্রতিকারের জন্য আবেদনযুক্ত বক্তব্য প্রকাশ করা হতো। এখানে দুটি পক্ষ হয়ে উভয় পক্ষের রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তি চলত। দারিদ্র-পীড়িত জনগণের রূপক হিসেবে গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি পরনে ধুতি (মালকোঁচা করে), কপালে চুনের টিপ, মাথায় ও হাতের কবজিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি ব্যবহৃত হতো। এসকল রূপকের অর্থ সরকারের দরবারে সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ জানানো। এভাবে কিছুক্ষণ সংলাপনির্ভর নাট্যাভিনয় চলার পর 'শিব' উপস্থাপিত সমস্যার প্রতিকারের আশ্বাস প্রদান করতেন। এ ধরনের এক একটা অনুষ্ঠান প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টাব্যাপী এবং অন্তত চার থেকে পাঁচটি বিষয়বস্তু নিয়ে চলত (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪৩)। বিষয়বস্তু হিসেবে বিভিন্ন সমস্যা যেমন – ভাষা সমস্যা, ইংরেজি শিক্ষার কুফল, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি উপস্থাপিত হতো। এছাড়াও হাল আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় রাজনীতির কথাও বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে আসত (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪৪)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ তাড়াও আন্দোলনে গম্ভীরার উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। শিল্পীরা এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সামগ্রিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরতেন বলিষ্ঠতার সাথে। এ সময় গম্ভীরা গান হয়ে ওঠে বর্ষ-বিবরণীর উপস্থাপনার পরিবর্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার। গম্ভীরা গানের উদ্দেশ্য হলো কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শাসকের তথা সমাজের দোষ-ত্রুটি, গ্লানি বা অসঙ্গতি দর্শক-শ্রোতার সামনে তুলে ধরা। স্বাভাবিকভাবেই গম্ভীরা গানে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো প্রাধান্য পেত।

পূর্বে গম্ভীরা ছিল মূলত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া; কিন্তু বর্তমানে তার রূপ পালটে গেছে। শিব দেবতার স্থলে উপলক্ষ হয়েছে সমালোচিত ব্যক্তি। নানা-নাতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সে সম্পর্কিত অন্যায় বা দুর্নীতিকে সুনিপুণ কটাক্ষে সমালোচনা করেই এসব গান রচিত হয়। গম্ভীরা গানে শিবের উপস্থিতি খুব বেশি দিনের নয়। ইংরেজ বাজারের বিখ্যাত গম্ভীরা গায়ক বিশ্বনাথ পণ্ডিতের মতে প্রায় আট-নয় দশক আগেই এর প্রচলন। শিবের চরিত্রকে গম্ভীরা গানে উপস্থিত করা ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সুফি মাস্টারের অবদান অনস্বীকার্য। শিব এখন সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিভূ। সুতরাং রূপকার্থে শিবের এই বিশিষ্ট ব্যবহার অন্য কোনো লোকনাট্যের মধ্যে দেখা না যাওয়ায় গম্ভীরা কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪১)। শিবের এই প্রতীকী অবস্থান পরিবর্তনের পেছনে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় প্রদ্যোত ঘোষের আলোচনায়। তাঁর বিবরণ মতে –

> ১৯২০-২৩ সালের মধ্যে কোনো এক সময় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বাংলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মালদহে আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের (শিব বা মহাদেবের অপর নাম) সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন বলে ঠিক করলেন। এই উদ্দেশ্যে

> তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত স্যার আশুতোষ মালদহে না এসে তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন।

মোহাম্মদ সুফী তবুও শিবকে উপস্থিত করে নিম্নরূপ ব্যঙ্গাত্মক গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন –

> হে দ্যাখ্, হে দ্যাখ্ কারে ডাকতে
>
> কেডা এল ভাইরে –
>
> ইনি কি স্যার আশুতোষ? হাই কোর্টের জজ
>
> গায়ে মাখা কেন ছাইরে? (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৪১)

এই ঘটনার পর থেকে পরবর্তীকালে সকল গম্ভীরায় শিবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এখানে শিব চরিত্রকে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিভূরূপে উপস্থিত করা হয়েছিল। গম্ভীরা গানের উদ্ভব হিন্দু সমাজে হলেও পরবর্তীকালে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তার প্রসারণ ঘটে। ফলে অচিরেই এ গানের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় তার চৌহদ্দির বাইরেও; বিশেষত দেশভাগের পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা গানে যে নতুনত্ব গড়ে ওঠে তা সমগ্র বাংলাদেশের সকল স্তরের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক ব্যতিক্রমধর্মী লোকসঙ্গীতরূপে মর্যাদা পায়। বলাবাহুল্য, গম্ভীরা গানে মুসলমানদের অংশগ্রহণের ফলে শিব বা ভোলানাথ ভোলা নানা হিসেবে সম্বোধিত হয়। যেমন–

> কাম কাজ না করিলে
> মান রহে না হে ভোলা নানা
> দেখ দুই দিন যদি বসে থাকি
> কেউতো খেতে কহে না হে ভোলা নানা। (তাসাদ্দক আহ্মাদ, ১৯৯৪ : ৫৬)

ইতঃপূর্বে যেখানে পরোক্ষভাবে শিব কাজ করেছে অর্থাৎ গানের আসরে শিবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হতো, দেশভাগের পর থেকে সে অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে এবং সে স্থান দখল করে নানা ও নাতি, কখনো দাদা-পৌত্র। অবশ্য এর পূর্বক্ষণে মামা-ভাগ্নে সম্পর্কেরও প্রচলন ছিল। নানা-নাতির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যত রসিকতা চলতে পারে, ততটা অন্য কোনো সম্পর্কে সম্ভব নয় বলেই হয়তো এই বিবর্তন। তাই এরপর থেকে চলতে থাকে নানা-নাতির নাচ-গান ও কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে গম্ভীরা গানে শাসক-শোষক তথা সমাজের দোষক্রটি, গ্লানি বা অসঙ্গতি দর্শক-শ্রোতার সামনে উন্মুক্ত করার প্রয়াস এবং তা রসিকতাপূর্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ সালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছিল অনুরূপ বর্তমান বাজারের অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত গম্ভীরা গানের পরিচয় মেলে –

> হে নানা দুঃখের কথা তুই শুন।
>
> বাজারেতে লাগাছে আগুন

চার টাকা দরে বিকায় বাগুন।
আলুর কথা যদি বলি, বস্তা ভরা পঁচে খালি
সইরসার তেলে কারতিল দিয়্যা
দাম হাকিছে দ্বিগুণ চাইয়া।
হামরা সারা রাইতে খাড়া হইয়া
মাথার ঘামে কাপড় ভিজ্যা
হইয়া গেল একাকার।
হে নানা দুঃখের কথা তুই শুন।
(সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সরদার আ. লতিফ সরকার, অক্টোবর ২০০৯, কুমিরজান গ্রাম, ভোলাহাট।)

বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত গম্ভীরা গানে মোহাম্মদ সুফি মাস্টার প্রবর্তিত ধারার প্রতিফলন দেখা যায়। এ অঞ্চলে গম্ভীরা গানের কেবল লৌকিক দিকটিই পরিবেশিত হতে দেখা যায় (মোমেন চৌধুরী, ২০০৮ : ৬৯)। আসলে এখন শিব-দেবতার স্থলে উপলক্ষ হয়েছে সমালোচিত ব্যক্তি। নানা-নাতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয় শুধুমাত্র বন্দনা গান এবং ডুয়েটের মাধ্যমে। গণতন্ত্রের উত্তরণ সম্পর্কিত একটি বন্দনা গান উল্লেখ করা হলো –

কাঁদবি কতকাল, মা তোর কি জঞ্জাল ॥
মাগো তোর অর্ডারে যুদ্ধ হল
কত রক্ত দিয়ে স্বাধীন হল
কত নেতা আইল গ্যালো
মোরা হইনু শুধু নাজেহাল।
মাগো, মনে করি পেলাম স্বাধীন
কিন্তু মোরা বিশ্বের অধীন
আবার মরব যেদিন হব স্বাধীন
তোর স্বাধীনের কিবা ফল ॥
(সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ফাইজুর রহমান মানি, অক্টোবর ২০১৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর।)

নানা-নাতির চরিত্রে গীত সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে ডুয়েট বা দ্বৈত পরিবেশনা। এখানে নানার ভূমিকাই বেশি। নানা বয়স্ক মানুষ, অভিজ্ঞতা অনেক। ইতিহাসের অনেক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান। অপরদিকে নাতির বয়স কম, বাস্তবতা সম্পর্কিত জ্ঞান সীমিত। তাই নানা-নাতির ঐতিহ্য, বর্তমান অবক্ষয়, শাসক-গোষ্ঠীর

তথা সমাজের ভুল-ত্রুটি, সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি পর্যালোচনা ও গঠনমূলক আলোচনা করে নানা, নাতিকে আগামী দিনের জন্য সচেতন করে তোলেন। ঘুঙুর পায়ে নাচের তালে তালে নানা-নাতির বাকচাতুরি, উপস্থিত-বুদ্ধি ও অঙ্গভঙ্গি দর্শক ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে (মোমেন চৌধুরী, ২০০৮ : ৭৪)।

গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু

সাধারণত গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তৈরি। এখানে সকল দল ও মতের ত্রুটিগুলো সমালোচিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু অনুপ্রবিষ্ট হয়। তবুও পৃথক পৃথকভাবে দুজন মুসলিম গম্ভীরা গান রচয়িতার নাম চলে আসে, তাঁরা হলেন, মোহাম্মদ সুফি রহমান ও মোহাম্মদ সোলেমান ডাক্তার। ধর্মের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে গম্ভীরা গানের উপস্থিতি এদেরই পদচিহ্ন লক্ষ করে (মোমেন চৌধুরী, ২০০৮ : ৪৬)। গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় তাসাদ্দক আহমাদের বর্ণনায়। তিনি উল্লেখ করেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুতে রাজনীতি প্রবেশ করায় তার সর্বজনীনতা ও আবেদনও হয়েছে ব্যাপক, কারণ ধর্মীয় আবেদন বেশিদূর এগুতে পারেনি – জাতি-ধর্মের চৌহদ্দিতে তা আটকা পড়ে গেছে। উদার মুসলিম গম্ভীরা কবিরা তা-ই প্রকাশ করেছেন, যা রাজনৈতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জনজীবনকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। সমাজজীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যার হাজার জগদ্দল পাথর যে চেপে বসেছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে (তাসাদ্দক আহ্‌মাদ, ১৯৯৪ : ৩৬)।

এক সময়ের গম্ভীরা গানে সারা বছরের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ স্থান পেত এবং মধ্যযুগীয় সনাতন বিশ্বাসে শিবকে সুখ-দুঃখের নির্বিকার প্রতীকীরূপে কল্পনা করে তাঁর কাছে নিবেদন করা হতো। মানুষ যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তখনই তার প্রতিকারার্থে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিবের শরণাপন্ন হয়েছে (তাসাদ্দক আহ্‌মাদ, ১৯৯৪ : ৫৩)। তাঁদের বিশ্বাস, 'এ সব কিছুই হয় শিবের ইচ্ছায়। শিবই সকল প্রকার সামাজিক ও বক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ।' ফলে গানের বিষয় হিসেবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা পৌরাণিক, শিল্প সম্পর্কিত, ব্যক্তি পরিচিতিমূলক এবং প্রেমমূলক গানসহ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা, কখনও রূপক অর্থে, আবার কখনও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বৈষম্যমূলক ক্ষেত্রসমূহের তির্যকভাবে সমালোচনা করা হয়। যদিও এসকল তির্যক সমালোচনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ এবং ফলাফলসমূহ থেকে গেছে বরাবরই সবার অগোচরে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ঠাট্টা-মস্করার বাণ-বর্ষণ একদিকে যেমন আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম অন্যদিকে তেমনি নিজ অধিকার সংরক্ষণের উপায় হিসেবে কাজ করে।

শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে হাস্যরসযুক্ত গম্ভীরা গান পরিবেশনা যেমন বিপুলভাবে সমাদৃত হয় ঠিক তেমনি সময়ের আবর্তে শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে এসকল নাট্যরীতির বিষয় ও পরিবেশনগত দিকও পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন – মালদহ জেলার গম্ভীরা গানে যে শিবকে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে শিবের স্থলে বৃদ্ধ নানা ও নাতির চরিত্র দেখা যায়। আবার মালদহ অঞ্চলের কোথাও কোথাও একেবারেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গম্ভীরা গান পরিবেশন করা হয়– যার সাথে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে পরিবেশিত গম্ভীরা গানের অমিল রয়েছে। এ কারণেই আঞ্চলিক ভিন্নতার অন্তরালে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় কাহিনি। এই কাহিনিসমূহ গঠনের পেছনে রয়েছে নিম্নবর্গের দ্বারা সংগঠিত অজানা অসংখ্য প্রতিরোধের ঘটনা, আনুগত্যের ঘটনা, উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গকে Hegemony করার ঘটনা ইত্যাদি। এসকল নাট্যানুষ্ঠান এখনও বর্তমান সমাজের উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গম্ভীরা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও ভোলাহাট এই পাঁচটি থানা নিয়েই নবাবগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পোরশা থানাও নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে নবাবগঞ্জ থানা মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও রাজশাহীর সঙ্গে নবাবগঞ্জের মানুষের ঘনিষ্ঠতা ও যোগসূত্র খুব বেশি ছিল। একমাত্র মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাচারি ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজ ব্যতীত নবাবগঞ্জের মানুষ শিক্ষাসহ যে কোনো ধর্মীয় উৎসব বা কেনাকাটার ব্যাপারে রাজশাহীমুখী ছিল। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোদাগাড়ির জনসাধারণের মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক-সামাজিক কার্যাবলির অদ্ভুত মিল থাকার কারণে চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে অভিন্ন রীতিনীতির প্রচলন ছিল। কারণ হিসেবে জানা যায়, নবাব আলীবর্দি খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিমবঙ্গ মারাঠা বর্গী কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি স্থান থেকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবার, কংস শিল্পী ও বহু মুসলমান সওদাগর গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থল বর্তমান নবাবগঞ্জ ও গোদাগাড়ির বরেন্দ্র ভূমিকে নিরাপদ মনে করে বসতি স্থাপন করে। বর্গীদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জুলুম ও নারী নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে হাজার হাজার কৃষক পদ্মা পার হয়ে রাজশাহী, গোদাগাড়ি ও নবাবগঞ্জ এলাকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়। কাজেই এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যাবলির মিল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৩৭)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার পর সুফি মাস্টারসহ বহু মুসলিম গম্ভীরা গায়ক নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট থানায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলে তাঁদের পক্ষে গম্ভীরা গানের প্রচার ও প্রসার অনেক সহজসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় (তাসাদ্দক আহমাদ, ১৯৯৪ : ৩৫)। দেশবিভাগের পর বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে সুফি মাস্টারের আগমনের প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও

এটুকু ধারণা করা যায় যে, কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা অপ্রীতিকর অবস্থা ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র আঞ্চলিকতার টানে প্রভাবিত হয়ে তিনি এ দেশে আগমন করেছিলেন। দেশবিভাগের পর ডা. মোহাম্মদ সোলেমান, পশুপতি মোক্তার, নঈমুল হক প্রমুখ গম্ভীরা গান রচনায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে গম্ভীরা গানের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনে রাকিবউদ্দীন ও কুতুবুল আলমের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মাধ্যমেই গম্ভীরা গান জাতীয় পর্যায়ে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে। মাহবুবুল আলম এবং বীরেন্দ্রনাথ ঘোষও গম্ভীরা গান পরিবেশন করে ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলাদেশে গম্ভীরা গানের প্রচার ও প্রসার যেমনই হোক না কেন বর্তমানে বিভিন্ন উৎসব, দিবসপালন অথবা কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে গম্ভীরা গানের আয়োজন করা যেন একটা সামাজিক রীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্কুলগুলোতে দিবস উদযাপন উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদেরকে গম্ভীরা গানের আয়োজন করতে দেখা যায়। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহী স্কুলের শিক্ষকেরা গম্ভীরা গান পরিবেশনায় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও সদরের বাইরে থানা পর্যায়ের বিভিন্ন এলাকায় অনেক গম্ভীরা দল রয়েছে যারা অর্থের বিনিময়ে তথ্য প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক গম্ভীরা গান পরিবেশন করে থাকেন। মাঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমভিত্তিক সংগঠিত গম্ভীরা দলের একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- মাহবুব-মানি ও তাঁর দল - চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- এমএ পাস খায়রুল ও তাঁর দল - চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- শিষ মোহাম্মদ ও তাঁর দল – চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- শাহজালাল মনির ও তাঁর দল – চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- প্রয়াস ফোক থিয়েটার (এনজিও) – চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- ছাবিনা-সাবরিনা ও তাঁর দল – (মহিলা গম্ভীরা দল) চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- টাইগার ও তাঁর দল – গোমস্তাপুর থানা।

রাজশাহী শহর-কেন্দ্রিক প্রধান দুটি গম্ভীরা দলের সন্ধান পাওয়া যায়। দলগুলোর একটি হলো মাথুল সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী, দলনেতা মো. বকুল, রাজশাহী থিয়েটার এবং অপরটি হল সান্ধ্যপ্রদীপ সাংস্কৃতিক একাডেমী, দলনেতা জনাব মিন্টু। এছাড়া, গম্ভীরা গানের ক্ষেত্রে ভোলাহাট থানার কুমিরজান গ্রামের অন্তর্গত সরদার আ. লতিফ সরকাররের নাম উল্লেখযোগ্য (মোমেন চৌধুরী, ২০০৮ : ৭৫)। উপরে উল্লেখিত দলের বাইরে আরও দুটো দলের খবর জানা যায়। যেমন – আব্দুল আজিজ মাস্টারের দল, মোনাকোষা গ্রাম, শিবগঞ্জ থানা। যিনি বয়স এবং ধর্মীয় অনুভূতির

কারণে বর্তমানে গান-বাজনা একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন। অপর একটি দল হলো ভোলাহাট থানার জামসেদের দল (খালে আলেমপুর)। জামসেদের দলের নাতি চরিত্রে রূপ দানকারী অভিনেতা মো. রিপনের অকাল মৃত্যুতে জামসেদের দল ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তিনটি স্তরে যথাক্রমে (১) রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়, (২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর পর্যায়, এবং (৩) গ্রাম পর্যায়ে এতৎসংক্রান্ত মাঠকার্য অনুসন্ধানে সমগ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় গম্ভীরা দলের এরূপ বর্তমান ও বাস্তব চিত্র দেখা গেছে। এসকল দলের দলনেতা ও সদস্যদের সাথে আলোচনা ও বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে উন্মোচিত হয় কয়েকটি নতুন দিক; যেমন – নারী-পুরুষ বৈষম্য, নতুন-পুরাতনের চিরাচরিত শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ক্ষমতার প্রয়োগ, যোগাযোগ ও আধিপত্য বিস্তারকেন্দ্রিক নিরবচ্ছিন্ন কিন্তু অদৃশ্য লড়াই। গম্ভীরা গানের সাথে সম্পর্কিত উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ক্ষমতা ও আধিপত্য কেন্দ্রিক এ সকল অদৃশ্য লড়াইয়ের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শহর অঞ্চল থেকে একজন ও গ্রামাঞ্চল থেকে একজন করে মোট দুইজন গম্ভীরা শিল্পীর কেইসস্টাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের মাহবুব-মানি দলের ফাইজুর রহমান মানি, বয়স ৪৬ বছর, পিতা (মৃত) ইউনুস রহমান, হাসপাতাল রোড, প্রায় ১৮ বছর ধরে গম্ভীরা গান করে আসছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ ডিগ্রি কলেজ থেকে বিএ (পাস) পাশ করার পর প্রথমে মেডিমেট ও পরে এ্যারিস্টোফার্মা নামে একটি ঔষধ কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলাতে দীর্ঘ ছয় বছর কাজ করেন। দীর্ঘদিনব্যাপী তৈরি হওয়া কাজের একঘেয়েমি কাটাতে তিনি মেডিকেল সেলস-রিপ্রেজেন্টেটিভের পেশা পরিবর্তন করে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী বীরেণ ঘোষের সাথে গম্ভীরা গান করেন। এ সময়ে (১৯৯৮-২০০১) তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। আগস্ট ২০০১ সালে বীরেণ ঘোষের মৃত্যুর পর তিনি দৈনিক পত্রিকা ইনকিলাবের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ ডিগ্রি কলেজের গ্রন্থাগারিক মাহবুবুল আলম, বয়স ৬০ বছর, পিতা সাদাতুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর– এর সাথে জুটি বেঁধে গম্ভীরা দল গঠন করেন। প্রায় ষোল বছর ধরে মাহবুব-মানি দল অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে গম্ভীরা গান পরিবেশন করে আসছেন।

গম্ভীরা গানের বিষয় পরিবেশনা সম্পর্কে ফাইজুর রহমান মানি বলেন,

> পূর্বে যারা গম্ভীরা গান করতেন, তারা বিষয় ও ব্যক্তির নাম ধরে প্রত্যক্ষ সমালোচনা করতে পারতেন। কারণ, সে সময়টাতে সামাজিকভাবে সেই সুযোগ ছিল। প্রত্যক্ষ সমালোচনা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। মানুষ সেটাকে গ্রহণ করত। বর্তমানে অবস্থা পাল্টে

> গেছে। মানুষ অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে গেছে। এর ফলে, এখন কোনো বিষয়ে গম্ভীরা গানের সমালোচনার কৌশলও পাল্টেছে। এখনকার সমালোচনাগুলো করা হয় পরোক্ষভাবে। ঠিক এমনভাবেই করা হয়, যা কর্তৃপক্ষ হয়তো সহ্য করতে পারে না। লাগবে কঞ্চির মতো কিন্তু হাসবে।

ফাইজুর রহমান মানির সরল তথ্যপ্রবাহ গবেষণা অনুসন্ধান কার্যের আরও গভীরে যেতে সহায়তা করে। তথ্য প্রদান ছাড়াও তিনি তাঁর দীর্ঘসময় ধরে গম্ভীরা গানের সাথে সম্পৃক্ততার ফসল হিসেবে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো দেখতে দিয়ে সহায়তা করেন। তাঁর সাথে দীর্ঘ ও গভীর আলোচনায় (Indepth Interview) তাঁর ব্যক্তিগত ও গম্ভীরা গান সম্পর্কিত আরও তথ্য জানা যায়। এ যাবৎ তিনি তিন হাজারেরও বেশি সংখ্যক গম্ভীরা গান রচনা ও পরিবেশন করেন। মাহবুব-মানি গম্ভীরা জুটি যাদের সহায়তা গ্রহণ করে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন তাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – (১) সাধারণত দেশি ও বিদেশি সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন/ সাহায্য সংস্থা, (২) মাল্টি-কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং (৩) স্থানীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী শ্রেণি। মাহবুব-মানি গম্ভীরা জুটির ক্ষেত্রভিত্তিক গম্ভীরা গান পরিবেশনের একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

দেশি ও বিদেশি সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন/সাহায্য সংস্থা

- টিআইবির আর্থিক সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপনায় 'দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে সহযোগিতায়।
- দেশব্যাপী জরুরি অবস্থার সময় (২০০৫-২০০৭) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, জাইকা, ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপির অর্থায়নে তিনি সমস্ত দেশব্যাপী গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।
- এডিডির সহযোগিতায় শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিদের বিষয়ে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (সমগ্র অঞ্চল), ঢাকা অঞ্চলে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।
- ইউনিসেফ-এর সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী বিষয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে গম্ভীরা গান পরিবেশনের কাজ করেছেন।
- ডেমিয়েন ফাউণ্ডেশনের পক্ষে ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ছয় বছর গম্ভীরা গান পরিবেশনার কাজ করেছেন।

মাল্টি-কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

- সিটিজেন চার্টার-এর আর্থিক সহযোগিতায় নাগরিক সমাজের উপরে তিনি গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।
- কানেকটিং বাংলাদেশের পক্ষে মুন্নী সাহার তত্ত্বাবধানে তথ্য প্রচারণামূলক গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।

স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত গম্ভীরার বিষয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী শ্রেণি

- চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম, বাংলাদেশ ও ভারতের বর্ডার এলাকা কেন্দ্রিক আম, মাদক ও অস্ত্র ব্যবসার কারণে দেশ ও সমাজের উপর প্রভাবিত ক্ষতিকর দিকসমূহ উল্লেখ করে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।
- নওগাঁ নিয়ামতপুরে পরিকল্পনামন্ত্রী এ. কে. খন্দকারের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে (নিয়ামতপুরের রহমত চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে)।
- মু-মালা হাইস্কুলের ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রোজার ঈদ, কোরবানীর ঈদ বিষয়ে ২০১৩ সালে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর পৌরপার্কে ২০০৫ সালে ইরাক হামলার সময়ে 'সম্মিলিত শিল্পী সমাজ' নামক বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।
- প্রতিবছর মে-জুন মাসে আমের মেলা উপলক্ষে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন (প্রভাবশালী আম ব্যবসায়ী রাজন-সুমন পৃষ্ঠপোষকতা করেন)।

মাহবুব-মানি গম্ভীরা জুটি শুধুই জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এমনটা নয়। অনেক সময় তাদেরকে স্থানীয় সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীনও হতে হয়। যেমন; ২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক গম্ভীরা গান গাওয়ার সময় চাঁপাই-পৌরপার্কে মুহুর্মুহু বোমা ফাটানো হয়। সাময়িকভাবে পণ্ড করা হয় গণজাগরণ মঞ্চ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধৃতি দিয়ে দীর্ঘ বেনামী চিঠি দেয়া হয়। পরে জানতে পারেন, ধর্মীয় উন্মাদনার জ্বরে আক্রান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাদের সাথে আপোসে আসেন। তবে অনুরোধ করা হয়,যেন ঐ বিশেষ দল সম্পর্কে কোনো কটূক্তিমূলক সমালোচনা না করা হয়। ফাইজুর রহমান মানি বলেন, যারা এ কাজ করেছে, তারা প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত। তাদের আপোস করার কারণ জানতে চাইলে, মানি জানান,

> আসলে এদের প্রত্যেকেই আমাদের যথেষ্ট ভয় পায়। এই যেমন ধরেন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। রোজা রাখি। এর পাশে গম্ভীরা গান করি। গম্ভীরা গানে খারাপ কিছু নেই। বরং সমাজের মানুষের জন্য তথ্যবহুল বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। আমরা কোথাও কোনো গানে ওদের কিছু যদি ফাঁস করে দেই – এ কারণে ওরা আমাদের সমীহ করে চলে। আমরা জানি, ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না।

দলের ভেতর পছন্দ-অপছন্দ, অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ – এরকম সাধারণ এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দেখা দেয় অন্তর্দলীয় জটিলতা। মানি জানান, আমার দলেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। যেমন, সুন্দরপুর চর এলাকার টিম থেকে রাগারাগি করে বের হয়ে গেছে আতাইর ও কেরামত সরকার। তারা মনে করেছিল, আমার সাথে কাজ করে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। তাদেরকে আর্থিকভাবে ঠকানো হচ্ছে। তাই তারা আলাদা হয়ে নিজেরা একটা দল খুলে বসল – এরকম। গম্ভীরা গানের পরিবেশনা ও পেশাদারিত্ব সম্পর্কে মানি বলেন, 'গম্ভীরা এখন মাইক্রো পারফরমেন্সে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো অনুষ্ঠানে গম্ভীরা পরিবেশনা থাকবে কিন্তু সেটা সবার শেষে, সময় বেধে দিবে মাত্র ১৫ মিনিট। মাত্র ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে দর্শককে কি দেয়া যায়?' তিনি আরও জানান,

> যদি কোনো বিষয়কে ধর্মীয় অথবা সামাজিক আচার-আচরণের একটি অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা না যায় তাহলে সেটা সমাজ থেকে একসময় হারিয়ে যাবেই। তা না হলে বিষয়টিকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেই হিসেবে গম্ভীরা গান ধর্মীয় গণ্ডির চৌহদ্দি পেরোলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তার পেশাদারিত্বের জায়গাটা এখনও অ-পোক্তই রয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে গম্ভীরা গানের জন্য পারিশ্রমিক খুবই কম এবং অনিয়মিত। অনেক সময় কোনো পারিশ্রমিকই পাওয়া যায় না। বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দিতে হয়। কিন্তু দলের অন্য সদস্য যেমন বাঁশিবাদক, তবলচি, হারমোনিয়ামদার আছে। এদেরকে নিজের পকেট থেকে দিতে হয়। তখন নিজের কিছুই থাকে না, উল্টো বাকি পড়ে যায়। অন্যদিকে, স্থানীয় কর্পোরেট থেকে সম্মানজনক পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। এই যেমন – যক্ষ্মার বিরুদ্ধে রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোরের ২৫টি উপজেলাতে তিন মাসে ৫০টি অনুষ্ঠান করতে হয়েছে। বছরে এরকম কয়েকটি কাজের সুযোগ আসে বলেই পেশাদারি মনোভাব নিয়ে গম্ভীরা গান করে জীবন জীবিকা চালিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

মাহবুব-মানি জুটি জানান, প্রতি গম্ভীরা গানের পরিবেশনায় পারিশ্রমিক হিসেবে তাঁরা ৭০০০-৮০০০ টাকা নিয়ে থাকেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরে মোট ৬টি গম্ভীরা দল রয়েছে যাঁরা পেশাদারি মনোভাব নিয়ে গম্ভীরা গানের চর্চা ধরে রেখেছেন। কিন্তু বর্তমান বাজার দর অনুসারে গম্ভীরা শিল্পীদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। বর্তমান বাজার দরের বিপরীতে গম্ভীরা শিল্পীদের পারিশ্রমিক সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কারণ হিসেবে মানি বলেন, জীবিকা নির্বাহের জন্য গম্ভীরার রেট বাড়ানো সম্ভব নয়। যদি আমি রেট বাড়িয়ে দেই তাহলে কেউ না কেউ কম রেটে কাজটা করে দিবে। তিনি জানান, মাস প্রতি ৫০,০০০/- টাকা হলে তাঁর তিন মাসে খরচ চলে যায়। সেই হিসেবে প্রতি মাসে তাঁর প্রায় ১৭০০০ টাকা রোজগার করতে হয়। তিনি ও তার দলের সদস্যদের মাঝে গম্ভীরার পারিশ্রমিক বণ্টন সম্পর্কে বলেন, যদি একমাস কাজ করেন, তাহলে তিনি নেন ৫০,০০০ টাকা আর দোহার ও যন্ত্রীদলকে

দেন ৩০,০০০ টাকা। তিনি আশা করেন, যদি কোনো কাজে তাঁকে ডাকা হয় তাহলে আসল রেট জানিয়ে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয়া হলে তিনি খুশি হন। যদি তাঁকে না জানানো হয় তাহলে তিনি অখুশি হবেন। বিষয়টি এরকম যে, তাঁর সাথে চুক্তিপত্রে দেখানো হলো মাস প্রতি ৫০,০০০ আর তাঁকে দেয়া হল ৩০,০০০। এর ফলে তিনি নিজে নিজেকে বঞ্চিত মনে করেন না। কারণ, তাঁকে জানিয়ে তাঁর সম্মতিতে এটা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি প্রথম পক্ষকে ছাড় দিচ্ছেন। ফলত ক্ষমতার অবস্থানগত দিক থেকে তিনি ১ম পক্ষের করুণাগ্রস্ত নন। বরং ১ম পক্ষ তাঁর নিকট থেকে সুবিধা নিচ্ছে বলে তিনি পরবর্তী বিষয়গুলোতে কোনো না কোনো সুবিধা আদায়ের সুযোগ পাবেন বলে আশা করেন। অপরদিকে, রাজশাহী সদরের গম্ভীরা শিল্পী বকুল জানান, সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি গম্ভীরা পরিবেশনায় ৫০০০ টাকা হলে তাঁর চলে। তিনি দলের প্রত্যেককে সমানভাবে আর্থিক বিষয়টি বণ্টন করেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, রাজশাহীর বকুল দলের প্রত্যেক সদস্যের সাথে নিজের পারিশ্রমিকের অংশ সমানভাবে বণ্টন করেন বিধায় তাঁর দল দীর্ঘ দিন ধরে এককভাবে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রাজশাহী সদরে বকুলের নিজস্ব চার তলা বাড়ি রয়েছে, গম্ভীরা গান পরিবেশনের জন্য তাঁদের নিজস্ব জিপগাড়ি রয়েছে। অন্যদিকে ফাইজুর রহমান মানির ক্ষেত্রে বকুলের ঠিক বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়, যেমন – ঘন ঘন তাঁর দলের সদস্যদের পরিবর্তন, আর্থিক বিষয়ে মনোমালিন্য, দলছুট হয়ে নতুন দলগঠন, কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা ইত্যাদি।

রাজশাহী সদরের অন্তর্গত গম্ভীরা শিল্পী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পীদের সাথে আলাপকালে উভয় দলের মধ্যে একটি স্বাভাবিক পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। যেমন – রাজশাহী সদরের গম্ভীরা শিল্পীবৃন্দ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলে নিজেদেরকে গম্ভীরা পরিবেশনার ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছেন। যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য রক্ষা এবং প্রতিটি কাজের তথ্যসমূহ সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এসকল বৈশিষ্ট্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় না। যদিও উভয় এলাকার শিল্পীবৃন্দ এই গবেষণা কাজে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। স্বভাবতই চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিল্পীরা রাজশাহীর গম্ভীরা শিল্পীদের সম্পর্কে খেদ ও বিষোদগার করে। কিন্তু সেই বিষোদগার সরাসরিভাবে গম্ভীরাকে কেন্দ্র করে নয়, একটু ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পী ফাইজুর রহমান মানি ও ছাবিনা ইয়াসমিন বলেন, রাজশাহী বিভাগীয় শহর হিসেবে ওখানে যারা গম্ভীরা করেন, তারা বিভিন্ন কোম্পানি, মাল্টিকর্পোরেট সেকশনে গম্ভীরা করার বেশি সুযোগ পায়। এছাড়া, যে সকল পণ্যের উৎপাদনস্থল চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সে সকল পণ্যের নিয়ন্ত্রণ-অফিস রাজশাহী সদরে স্থাপন করা হয়েছে। যেমন, সিল্কসিটি (রেশমগুটি চাষ প্রকল্প), ম্যাংগো রিসার্চ সেন্টার, সেরি কালচার ইত্যাদির অফিস রাজশাহীতে অবস্থিত। এ সকল বিষয়ের বিবেচনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পীদেরকে ন্যায্য সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে তাঁরা খেদ প্রকাশ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের দলগুলোর শিল্পীবৃন্দ রাজশাহী সদরের শিল্পীবৃন্দের তুলনায় নিজেদেরকে কুলীন শিল্পী মনে করে থাকেন। উচ্চারণ বিষয়ে রাজশাহী সদরের দলের তুলনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের দলগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য অনুসারে, রাজশাহীর দলগুলোর শিল্পীরা যে গম্ভীরা পরিবেশন করে সেটা বিকৃত গম্ভীরা। ভাষাগত শুদ্ধ উচ্চারণের অপারগতা তাদের দুর্বলতম দিক। যদিও সাধারণ মানুষের কাছে এ সকল ছোট-খাট বিষয়গুলো বোধগম্য নয়। তারা যে গম্ভীরা করে সেটা সঠিক গম্ভীরা নয়। গম্ভীরার সঠিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র চাঁপাইয়ের লোকদের পক্ষেই সম্ভব। পূর্বে মালদহ, ভোলাহাট ও বারোঘরিয়া চাঁপাইয়ের ভেতর ছিল এবং মালদহ সদরে পূর্বে গম্ভীরা গান হতো। শুধুমাত্র উচ্চারণ/টোনের কারণে অর্থ পরিবর্তিত হয়। যেমন 'শালা' শব্দের উচ্চারণ 'ছালা'; 'কহেন', 'কহাক' শব্দগুলো রাজশাহীতে 'কোহাক', 'কোহানে', 'বে' হিসেবে উচ্চারিত হয় – এরকম বহু শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। শুধু জীবনযাত্রার বিষয়েই নয়, উচ্চারণের দিক দিয়ে যেমন রাজশাহীর সাথে অমিল রয়েছে তেমনি মানসিকতার দিক দিয়েও চাঁপাইয়ের সাথে রাজশাহীর বেশ অমিল রয়েছে। রাজশাহীতে বিভিন্ন কর্পোরেট সেকশনের অফিস হবার কারণে তাঁরা সুবিধাগুলো বেশি পাচ্ছে অপরদিকে সাধারণ শ্রোতা গম্ভীরা গান সম্পর্কে ভুল বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং আসল বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। রাজশাহী সদরের গম্ভীরা শিল্পী সম্পর্কে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পীদের অনুরূপ অনুরণন শোনা যায় শচীকান্ত দাসের প্রবন্ধে, গম্ভীরার একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে। সেই উচ্চারণজনিত ভঙ্গির সামান্যতম বিকৃতি ঘটলেই রসহানি ঘটবে (শচীকান্ত দাস, ২০০৮ : ৫৭)।

রাজশাহী সদর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরাদলের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে একই দল কোনো একটি বিষয়ে একাধিকবার গম্ভীরা গান পরিবেশন করে থাকে। গম্ভীরার পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করে দেখা গেছে গান পরিবেশনার সময় ব্যবহৃত চিরকুটে শুধুমাত্র ছন্দযুক্ত কবিতার কয়েকটি ছত্র বা লাইন উল্লেখ থাকে। তার আশেপাশে প্রধান অতিথি, আয়োজক বা যাদের নাম-পদবী বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হবে তা উল্লেখ থাকে। কিন্তু দর্শকের জন্য হাস্যরসযুক্ত আনন্দের উৎস হিসেবে প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক যে 'কথামালা' পরিবেশন করে তার পুরোটাই তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট। গম্ভীরা শিল্পীদের কোনো একটি দলের পরিবেশনাগুলো ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করলে এ সকল শিল্পীর টিকে থাকার বৈচিত্র্যময় দিকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে মাহবুব-মানি জুটির সাথে আলোচনাকালে মানি হঠাৎ করেই রাস্তার অপরদিকের একজন মটরসাইকেল আরোহীর দিকে তড়িৎবেগে ছুটে গেলেন, খুব নিচুস্বরে কিছু কথা বলে ফিরে আসলেন। মটরসাইকেল আরোহী সহাস্যে চলে গেলেন। মানি ফিরে এসে বললেন, 'ইনিই সেই রহমত চেয়ারম্যান (নিয়ামতপুর)। এক বছর হলো, এখন পর্যন্ত বায়নার টাকাটা পর্যন্ত পরিশোধ করেন নাই। এদিন-সেদিন দিবেন বলে শুধুই ঘুরাচ্ছেন। ইচ্ছে করলে মটর সাইকেলের

চাবি নিয়ে বলতে পারতাম, পাওনা টাকা দিয়ে চাবি ফেরৎ নিবেন কিন্তু তা করলাম না, বরং সুবিধা-অসুবিধার খবর নিয়ে ছেড়ে দিলাম।' মানবিক উদারতার এসকল পরাকাষ্ঠার পশ্চাতে শ্রেণিদ্বন্দ্ব এবং সংঘাত বিনির্মাণের বিপরীতে যে ব্যক্তিস্বার্থ লুকিয়ে আছে তা অনুসন্ধান করা এ গবেষণার একটি প্রধান বিষয়।

সরদার আ. লতিফ সরকার, ভোলাহাট

সরদার আ. লতিফ সরকার, পিতা–গিয়াস উদ্দিন সরকার, গোহালবাড়ি ইউনিয়ন, কুমিরজান গ্রাম ১৯৬৮ সাল থেকে স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় গম্ভীরা গানের সাথে যুক্ত আছেন। তাঁর বাবা আলকাপের গান করতেন। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বাধা থাকার কারণে নিজ এলাকার বাইরে গান করতেন। আলকাপ গানের পাল্লাপাল্লিতে অনেক প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারতেন। যদি কখনও তার বাবা সম্পর্কে দাদার কাছে স্থানীয় লোকজন নালিশ জানিয়েছে, 'তোমার বেটা এট্টা করিছে। দাদা বলতেন, ওগে মারবো কোনঠে, জায়গা পাই না। ও থাকাতে ইজ্জত বাড়িছে।' তিনি যে কোনো বিষয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অন্ত্যমিল ছন্দে কবিতা লিখে দিতে পারেন। স্বভাবজাত এই শিল্পী সম্পর্কে প্রথম তথ্য জানা যায় ২০০৮ সালে মোমেন চৌধুরীর প্রবন্ধে (মোমেন চৌধুরী, ২০০৮ : ৭৫) এবং প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২০০৯ সালে ভোলাহাটের অন্তর্গত তাঁর নিজ বাড়িতে। বর্তমানে পারিবারিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের চাপে তাঁর শিল্পীমন অসাড় ও কোনঠাসা প্রায় (সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৮ মার্চ ২০১৪, কুমিরজান গ্রাম, গোহালবাড়ি ইউনিয়ন, ভোলাহাট থানা)। সেই আক্ষেপের সুর অনুরণিত হয় তাঁর কণ্ঠে। তিনি বলেন-

> কি করব রে! মনটা যে মানে না। কি আর করব। দোতারা বাজাবার ইচ্ছা ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বাজাতাম। অন্যের ঘুম নষ্ট হবে এই আশংকায় আম্মা নিষেধ করেছিলেন। চর্চার জন্য এলাকাতে কোনো ক্লাবঘর ছিল না, নিরুপায় হয়ে ছেড়ে দিলাম। আমরা তো গোবরে পদ্মফুল। আমরা আসল জায়গায় তো পদ্মফুল হতে পারলাম না। ধরে চেষ্টা তো আর কম করলাম না। ব্যাকিং নাই। বিশ হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিল। বলেছিলাম, আমি গরিব মানুষ, আমার দ্বারা অতো দেয়া সম্ভব হবে না। তাও বলেছিলাম, আমি দশ হাজার টাকা দিতে পারব। বলেছিল, না, দশ হাজার টাকাই লাগবে। আমার খুব ইচ্ছা ছিল। এখনও গাইবার খুব ইচ্ছা। জীবনে আর কটা দিন বাঁচব। এখন যেটা রেখে যাব সেটাই ভাল। চেষ্টা করলাম। আজ অবধি হল না। এরপর আর কোনে সুরাহা পেলাম না। স্থগিত দিলাম। তবুও তারপরে বিভিন্ন মেলায় অনুষ্ঠানে যারা গায় তাদেরকে গান লিখে দিলাম; গম্ভীরা, দেশাত্মবোধক, পল্লিগীতি ইত্যাদি গান। এসে ধরে বলে, তোমার গান ভাল। লিখে দাও। এটা আমি করব। গান করে পুরস্কার পায়। জানতে চায়, গানের গীতিকার কে? গানের মধ্যে পল্লিগীতি আছে, আধুনিক সুরের আছে। দোস্ত ভাই (বাবার বন্ধুর ছেলে) গতকাল একটি অনুষ্ঠানে আমার গানটা গাইল। সকালে বাজারে আসলাম। কলাম কি পালি? পাইছিস কিছু? আইজ কুণ্ঠে ছিলি? ও জানাল, খুশি হয়ে ওনারা

> দুই শত টাকা বখশিস দিয়েছে। বলেছে, গানটা আসলে ফার্স্টক্লাস। তোমার কণ্ঠও ভাল। তারা জানতে চাইল, গানের গীতিকার, সুরকার কে? বল্লাম, আমাকে মিষ্টি খাওয়ালি না? উত্তরে বলল, চল তোকে মিষ্টি খাওয়াব। এটাই তো যথেষ্ট। তুই আমার নামটা বলেছিস। গানটা গাইলি। এটিই আমার জন্য যথেষ্ট, আর কিছু না।

উপরের উদ্বৃত অংশে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে গম্ভীরা শিল্পী সরদার আ. লতিফ সরকারের আবেগতাড়িত মর্মভেদী কিছু শব্দমালা। উল্লিখিত শব্দগুলো শুধুই না পাওয়া আর হতাশায় ভারাক্রান্ত জীবনের শেষ সংলাপ নয়। এগুলো গম্ভীরা গানকে কেন্দ্র করে গ্রাম পর্যায়ের জীবন লড়াইয়ে পরাজিত একজন শিল্পীর অশ্রুগাঁথা কাহিনির সংক্ষিপ্তসার। মাত্র এই কয়েকটি শব্দগুচ্ছের পেছনে রয়েছে অব্যক্ত কথামালার বৈচিত্র্যময় ইঙ্গিতপূর্ণ ইতিহাস যা কখনোই এই সভ্য সমাজের তথাকথিত ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না; যা ক্রমাগত রচিত হয়, সৃষ্টি হয় কখনো অগোচরে, ইঙ্গিতে অথবা অদৃশ্যভাবে এবং যা নিরন্তর বদলে দেয় তাঁর রচনার গতি-প্রকৃতি ও কৌশল। গম্ভীরা শিল্পী সরদার আ. লতিফ সরকারের গম্ভীরা গান পরিবেশনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা তাঁর নিজের বিবৃতিতে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ঘটনা-১ : উপজেলা চেয়ারম্যানকে 'না' বলা

সম্প্রতি (মার্চ ২০১৪, ভোলাহাট উপজেলা) উপজেলা অফিস থেকে লোক এসে অনেক অনুরোধ করেছে যে, উপজেলা পর্যায়ে ২৬ মার্চের একটি অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান করে দিতে হবে। তাকে না করে দেবার পর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ সাহেব লোক দিয়ে মটরসাইকেলে করে নিয়ে যান উপজেলা অফিসে। তারপর নিজে অনুরোধ করেছেন গম্ভীরা গান করার জন্য। প্রত্যুত্তরে সরদার আ. লতিফ সরকার বলেন, 'জামাই সাহেব এলাকার মসজিদের ইমাম। অনেক সামাজিক সমস্যা হয়।' চেয়ারম্যান বললেন, 'দরকার হলে জামাই সাহেবকে আশ্বস্ত করা হবে।' সরদার লতিফ অনমনীয়। তিনি জানান, 'তাহলে এটা বাধ্যতা হয়।' যেহেতু তিনি ইস্তফা দিয়েছেন, তাই তিনি আর করবেন না। তার সহযোগী আবদুল লতিব ভেগুরও কেন করবেন না? অসুবিধা কী ধরনের? ইত্যাদি জানতে চান। 'আপনাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করা হবে' ইত্যাদি বলে অনেক অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে সরদার আ. লতিফ জানান,

> বললাম, আমি কাজটা ভালই করি, আর মন্দই করি, কাজটাতে যদি ব্যাঘাত ঘটে এতে সংসার ভেঙে যায় তাহলে ওটা ভাল না খারাপ? উত্তর দেন। আমি একটা কাজ করব। সেই কাজে আমার একটা সংসার বা অন্য একটা সংসার ভেঙে যাবে দেখেন... আমি ভাল করছি... ওটা যদি সংসারটা ভেঙে যায় তাহলে এটা ভাল না খারাপ? এটা আমাকে উত্তর দেন। কহিছেন, দারুন লোকতো আপনি। আমি বললাম, সেটাই। হয়তো আপনি আমার সম্বন্ধে জানেন না। আমার তো ইচ্ছে

অনেক কিছু। এই ভোলাহাট উপজেলার মধ্যে আমি 'অনলি ওয়ান'। আপনি আমাকে একটি কারণ দিবেন, আমি সাথে সাথেই গম্ভীরা গান, জারি গান লিখে দিতে পারব। আর আমি এখনও ছেলে-মেয়েদেরকে লিখে দেই। কিন্তু ওখানে আমি আটকে গেছি। কারণ ওটা আমার জামাই এবং মেয়ের সংসার। পেছনে আমার শ্বশুরের মতো চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বলতে পারে, তোর জীবনে এতো শখ বা আর কিছু? এখন আবার জামাতের সরদার। জামাতভিত্তিক সমাজের সরদার। এটাকে উপেক্ষা করে গম্ভীরা গান করা সমাজের দৃষ্টিতে খারাপ।

ঘটনা-২ : প্রাইমারি মাস্টার এখন হাজি হইছে

আগে প্রতি বছর ৩০-৪০ খানা জারিগান, গম্ভীরা গান লিখে দিতে হত। বর্তমানে সেই জারিগান লেখার সংখ্যা ২-৩ টাতে নেমে এসেছে। একদিন সকালবেলা গার্লস স্কুলের কয়েকটা মেয়ে এল, সম্পর্কে নাতনি। বলল, হে দাদা, হামাকে একটা গান লিখা দিতে হবে। তবুও আমি ওকে বাড়িতে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেবার পর মোটামুটি দাড়াইছে। দুটি মেয়ে পারলো কিন্তু কোনো ছেলে পারলো না। এখন এসব উঠে গেছে। এখন ঐ দরদ-ই তো নেই। এমনি কৌতুক, জারি গানগুলো নিয়ে যায়। এমনি সুরতো করতে পারে না। করে, তবে নাই মামার চাইতে কানা মামাতো ভাল। এটা করে ওরা বকশিস পেলো, প্রাইজ পেলো। এতেই খুশি। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি, হঠাৎ করে মতি মাষ্টার আমার কাছে এমন করে স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে কেন পাঠাতে লাগলো। পরে বুঝলাম, যখন দেখলাম প্রাইমারির মতি মাস্টার হজ করে এসে আমার বিরুদ্ধে এলাকার আলেম সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলল; আমি গম্ভীরা গান লিখে দিয়ে, গম্ভীরা ট্রেনিং দিয়ে মেয়েদেরকে বেপর্দা শেখাচ্ছি। অনেক আগে থেকেই সবাই জানে যে, ওদের স্কুলেরই এক মাস্টারও গম্ভীরা লেখে। আর আমি লিখে দেই। গম্ভীরার গানগুলোতে ঘটনা, জিনিসের মিল না থাকলে তা বাস্তবের মতো হয় না। আমি যেগুলো লিখে দিতাম ওগুলোতে প্রাইজ পেতো, ফার্স্ট হতো। কারণ আমি যে পয়েন্টগুলো লিখে দিতাম সেগুলোর ছন্দমিল থাকত। কথাতেই সুর চলে আসত। আর ওদের ছন্দমিল ও সুর হতো না। যেমন 'হাই' আর 'যাই'; 'হাই'–এর কাছ দিয়ে যদি 'লেন' হয়, তাহলে সেটার ছন্দ মিল হবে না, সুর হবে না। সেই প্রাইমারি মাস্টার এখন হাজি হইয়ে অকাজগুলো করে বেড়াচ্ছে।

ঘটনা-৩ : পরিবার পরিকল্পনা ও যৌতুকবিরোধী গম্ভীরা গানে ভোলাহাট উপজেলা ইউএনও

ভোলাহাট উপজেলাভিত্তিক পল্লি গায়ক দল করা হবে এরকম খবর পেলাম। গোহাইল বাড়ি হাটে আমি আর আজিজুর রহমান, ইব্রাহিম, শুকুর চৌকিদার মিলে দলের খাতায় নাম লেখালাম। ইব্রাহিম খুব ভাল হারমোনিয়াম বাজায়। সে আমাদেরকে নিয়ে রিহার্সল দিল। ইব্রাহিম এর মধ্যে উপজেলায় গিয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য নাম লিখিয়ে এল। এরই মাঝে বহালটেকের নাজির স্যার এসে

জানালেন, অনুষ্ঠানে বড় নানা হলেন উপজেলা ইউএনও। তিনি এখনও অবিবাহিত আছেন। যদি ইউএনওর এই বিষয়টি গম্ভীরাতে নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটা খুব আনন্দের হবে। তখন ভোলাহাটের ইউএনও রফিকুল ইসলাম সাহেব। এলাকায় যৌতুক প্রথার সুবিধা নিয়ে কে, কবে, কোথায় টাকা নিয়েছে, যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে, যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেগুলোর তথ্য আমরা জানি। আমরা চারজন মিলে এসকল তথ্য মিলিয়ে নানা-নাতির পাঠ প্রস্তুত করলাম। আমি হলাম নানা আর ইব্রাহিম হল নাতি। নাতি চরিত্রে ইব্রাহিম একটা বিষয়ের কথা ধরলে নানা চরিত্রে আমি সেটা বিশ্লেষণ করব – এভাবে আমরা গম্ভীরা গান তৈরি করলাম :

এ কোন প্রথা আইল হে নানা

নাতিন পুতিন বিহা বুঝি হবে না

নাতিন পুতিন নিয়া মনে হইল বড়ো ভাবনা।

নাতিন : হ্যা বে নানা ! তোর এতো ভাবনা কিসের বে? পরিবার পরিকল্পনা দিয়ে হামাদের এ বড় নানা কী করিবে?

নানা : জাইনে লিবে !

নাতিন : জাইনে লিয়ে যদি কাজেই না লাগাল তাহলে সেটার কী উপকার আছে বে !

নানা : আচ্ছা, তোর নানি ফুসুর ফুসুর করে কি কহাছিল বে?

নাতিন : এতোগুলা ছেলেপুলে। তাই ভয়ে বিহা করে না।

ইউএনও অনেক খুশি হলেন, 'ভেরি গুড' বললেন। তিনি ডেকে আমাদের পরিচয় নিলেন। আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কার কেমন, উদ্যোক্তা কে এসকল খবর নিলেন। আমরা পরে জেনেছিলাম, গেল বার (গত বছর) ইউএনও সাহেব স্কুল উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ৩০ বান টিন অনুদান স্থগিত করেছিলেন। এর প্রতিশোধ হিসেবে নাজির স্যার ইউএনওকে অপমানিত করতে আমাদেরকে তার সম্বন্ধে কৌশলে উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলিয়েছিলেন।

ঘটনা-৪ : উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ ও বাচ্চামারি হাইস্কুল

গম্ভীরার কাজগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম; কিন্তু ব্যক্তির অন্তরে আঘাত না করা বরং কৃতকর্মের রূপ তুলে ধরা। যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে সে যেন বুঝতে পারে – এমনভাবে বলা। সবেমাত্র বাচ্চামারি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভোলাহাট উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন আব্দুস সামাদ সাহেব। স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি করে আনা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকেও গম্ভীরা পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, হামারগে স্কুলঘরে চেয়ার টেবিল নাই, পর্যাপ্ত বইয়ের আলমিরা নাই, ব্ল্যাকবোর্ড নাই ইত্যাদি। স্কুল কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও চাহিদা অনুসারে আমাদের গম্ভীরা গান উপস্থাপনার পর উপজেলা

চেয়ারম্যান উঠে দাঁড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা অনুমোদন দিলেন। এই যে একটা তুলে ধরা কথাবার্তা স্টেজেই হয়ে গেল। তখন ওখানটায় আর কিছু রং লাগিয়ে জিনিসটাকে কৌতুক আকারে তুলে ধরে। মানুষ হাসে। গম্ভীরাতে আমাদের উদ্দেশ্য এটাই।

ঘটনা-৫ : ফ্যামিলি প্ল্যানিং : লাইগেশন

ফ্যামিলি প্লানিংয়ের লাইগেশন বিষয়ে আমরা গম্ভীরা গান করেছি। এটা করার পর এলাকাতে খুব প্রভাব পড়েছিল। কোথাও বেড়াতে গেলে লোকজন জিজ্ঞেস করতেন, নানা লাইগেশন অপারেশন করেছেন? এমনিও আমি ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দিতাম।

নাতি : হে নানা, এটা যদি লাইগেশন করিস। পৌনে দুশ টাকা দিবে। লুঙ্গি দিবে। শাড়ি দিবে। ভেড়ি দিবে। বেশি হলে বেশি টাকা পাবি। ছেলে পুলে কম হলে তোর খাওয়া খরচ কম লাগবে। এতোগুলো ছেলেপিলে লিয়ে কি করবি?

নানা : শরমের কথা কইছিস তুই খালি। নানিতো কইরাছে। তো হামিও কইরবো?

নাতি : এট্টা কাম করলে হয় বে। এই গরুগুলা যে দাগায়। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘরে যাবে এখানে। বনে কি দাড়া যাইবে। শালা লাইগেশন না করে গরু দিয়ে লাগায় লাগায় ঘরে বইসে কইরবে। অফিস অফিস না যাইয়ে।

নানা : উইবে বলল, তারপর এই গত বছরের বন্যায় সব ফসল যে ডুবে গেল। খাদ্যের সংকট দেখা দিল।

নাতি : দেখো ছেলে পেলে বেশি হলে সাহেব বলবে গুড আফটারনুন। অর্থ কি দাড়লো? গুড় নাই। আটা আর নুন খাইতে কহিছে।

নানা : তুইতো ভাল ইংলিশ জানিস বে। হুড়ছি বেধেছে ও পেটে। তুই কত নিবি? থাম থাম তুই।

গম্ভীরা শেষে ভিডিপি টিএস মাহবুব আলম স্যার বলেছেন, আপনাদের গায়কদলের নানা ভালই বলেছেন। ইংরেজি শব্দ 'গুড আফটারনুন'–এর মানে আমরাও জানি, উনিও জানেন। কিন্তু ওনাদের বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারায় একেবারে বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন; 'গুড় নয়', 'আটা আর নুন খাচ্ছি' অর্থাৎ হালুয়া খাওয়া। ওনারা যেটা তুলে ধরছেন তাতে আমি খুব আনন্দিত। এটা যথার্থ অর্থে সমাজেরই কথা। খুব ভাল হয়েছে।

ঘটনা-৬ : গোবরে পদ্মফুল

উপজেলার এক কৃষি অফিসার আমার এই গানগুলো দেখে বলেছিল, 'আপনি গোবরে পদ্মফুল'। ঢাকা বেতারের কুটি মুনসুরও আমার গান দেখে বলেছিলেন, 'তোমার প্রতিভা অন্যরকম। আমাদের থেকেও তোমার প্রতিভা আলাদা। তুমি

নিজে গাইতে পার, লিখতে পার, সুরও অত্যন্ত চমৎকার। মানে মাধুর্যপূর্ণ। তুমি রাজশাহী বেতারে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগাযোগ কর।' বিগত চার বৎসর চেষ্টা করলাম। আম নিয়ে গেলাম। কতো কি করলাম। সংসার জীবনটা শেষ করে দিলাম। এটা আসলে ঘুষের বিষয় না। গান ভাল হইলে গানের মাধ্যমে সুরের মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে পারলেই হইল। আমি বললাম, 'হামাকে দেন না অডিশন একটা। আমি যদি পারি তাহলে আমাকে সিলেক্ট করবেন। না হলে আমি যাবো না।' বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে'। এরপর এই সেই করতে করতে সময় চলে গেল। ডাইরেক্টরকেও পেলাম। আসলে ভাগ্যে না থাকলে কিছুই হবে না। এখানে সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে কিনারে এসে নৌকা ডুবে গেল। আমি দেখেছি আমার জীবনের কয়েকটা জায়গাতে হয়েও শেষ পর্যন্ত হল না। আজকে তুমি এসেছো আমার এখানে। ভাগ্য ভাল হলে, আমি যেতাম তোমার ওখানে।

ঘটনা-৭ : তীরে এসে তরি ডুবে যাওয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্টেডিয়াম মাঠে ভিডিপির বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনেক বড় পরিসরে আমরা অনুষ্ঠান করছি, এতেই আমরা অনেক আনন্দিত। উপজেলা ভিডিপি এ্যাডজুটেন্ট আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন। ডিসি সাহেবকে বলা হল গম্ভীরা পরিবেশনের কথা। আমার শেষ ভাষণ স্থগিত করে ওদেরকে নিয়ে আসেন। আমি মাত্র ১৫ মিনিট থাকতে পারব। অনুষ্ঠান শেষে ডিসি সাহেব আমাকে খুঁজে বললেন, 'বারো তারিখে শিল্পকলাতে একটা অনুষ্ঠান আছে সরাসরি রেডিওতে সম্প্রচার হবে। আপনারা যেহেতু ভিডিপিতে আছেন। তাই গ্রাম প্রতিরক্ষা দলেরই বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরবেন।' উনি এসে আবারও বললেন, 'আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিব। আপনারা আমাকে বিরাগ করবেন না। দুদিন আগে আপনাদের নিয়ে যাওয়া হবে। যতোজন আছেন যাবেন। আপনাদের থাকা খাওয়া সব ব্যবস্থা করা হবে। আর সরাসরি আপনাদের অনুষ্ঠান টিভিতে সম্প্রচার করা হবে। আপনারা প্রস্তুতি নেন, কোনও চিন্তা করবেন না।' আমরা আরও আনন্দিত হলাম। আমরা ঠিক করলাম গম্ভীরা গানে কোনো কাগজ বা চিরকুট দেখব না। না দেখেই মৌখিকভাবেই আমরা গম্ভীরা পরিবেশন করব। গানের মধ্যে যাতে কোথাও আটকে না যাই, সেজন্য আমরা প্রচুর রিহার্সল করলাম। আমাদের দক্ষতার চূড়ান্ত অবস্থাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে আমরা কাগজ না দেখেই গান করতে পারি। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অনুষ্ঠান হবে। সেখানে তো আর এমনি যেমন তেমন করা হলে চলবে না। আমরা ইব্রাহিমের বাড়িতে মোরগ কিনে খাইদাই করলাম। সেদিন রাত প্রায় দেড়টার দিকে গাড়ি চলে আসল। সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করল। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এটা সাগর পাড়ি দিয়ে তীরে এসে তরি ডোবার মতো অবস্থা হল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে আমাদের গম্ভীরা গান করা আর হল না।

গ্রাম প্রতিরক্ষা দিবসে আনসার, ভিডিপির ভূমিকা ও গুরুত্ব বিষয়ক গম্ভীরা গান

হে নানা আমরা আনসার আমরা ভিডিপি হে

দেশের জন্য জীবন দিতে মানব না

হে নানা দেশের সেবা করেই মরি এটাই মোদের বাসনা
অস্ত্র হাতে নিয়ে নানা ট্রেনিং আমরা করেছি
আসুক যতো বাধা-বিপদ মাথা পেতে দিয়েছি নানা হে
দেশের তরে জীবন দিতে, বসে থাকবনা কোনই মতে
এগিয়ে যাব একই সাথে পিছু কভু হটব না।

ঘটনা-৮ : আকারে ইঙ্গিতে গম্ভীরা

আকারে ইঙ্গিতে অনেকগুলা ধরলাম। যেমন একটা স্কুলে অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। মুনিন মাতব্বর স্কুলের সেক্রেটারি। ওকে এমনভাবে দিয়েছি যে ও অনুভব করতে পারবে যে আমাকে এ কথাটা বলেছে। যার সম্বন্ধে এটা করা হচ্ছে সে বুঝতে পারছে যে সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি বলেই তাকে এভাবে বলা হচ্ছে এমনটা নেকজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে করেছিলাম। স্কুলটা ভেঙেছিল কিন্তু বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও মুনিন মাতব্বর স্কুলঘরটা ঠিক করছিল না। বর্ষা মৌসুমে মেয়েরা বৃষ্টির পানিতে ভিজে ভিজে ক্লাস করত। গান শেষে মুনিন মাতব্বর পরে আমাকে বলেছে যে, নানা, হামাকে আচ্ছা যাতা মারলেন। তাহলে সেটা আপনার বেপার। আপনি এখানে নেতা হয়ে আছেন। আপনি অবহেলা কেন করছেন? এসকল কাজ আপনিই তো করবেন, সহযোগিতা করবেন। আপনি ইংগিত দিলে সবকিছুই হয়ে যায়। অবশেষে বললেন, আচ্ছা ঠিক করে দিব এবং ঠিক হয়ে গেছে। এরকম ধরনের আমরাই করছি। যেমন স্কুলের শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ভাল করে পড়ালে তারা বৃত্তি পাবে। কাদাপানি কিছু মানে না, কাদার মধ্যেও শিক্ষকেরা ক্লাস নিচ্ছে – এগুলো গানে তুলে ধরার পরে এলাকার শিক্ষার্থীরা বলত, 'হারে জানিস, আমাদের মাস্টাররা কাদাপানি কিছু মানে না। রেজাল্টের দিক থেকে এখন সবার শীর্ষে।'

ঘটনা-৯ : এখানে কিছু লোক আছে কুটুনি

স্থানীয়ভাবে নিজ এলাকায় যারা বিরোধিতা করছে তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরদার আ. লতিফ সরকার বলেন,

এখানে আইসা আমি মসজিদে গাইয়াছি। এখানে কিছু লোক আছে কুটুনি। ভাল জিনিসগুলো তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। সেদিন মসজিদে একটা গজল করলাম। তারা মন্তব্য করল, হ্যাঁ... শালা গান গায়। সবই গায় গানের সুরে। ওই লোকগুলো কি বুঝে, বলেন? ওদের মন্তব্য আমি শুনলাম। সুযোগ পেলে জবাব দিব। এখানে যেগুলো গাজাল বলছে, সেগুলোতো গানের সুরকে বিকৃত করে এসেছে। সেগুলো কি এ মূর্খরা বুঝে? আমাদের গাজাল গাজালই। এটা তো কোনো গানের সুর তো না। এটা গাজালের সুর। তখন ওরা বইলছে, 'কি শালা খালি গান গায়। খালি গানের সুরেই গাজাল চালাছে। মাইকে খাড়া হইছে।' শুনলাম সবাইকে সালাম, ঠিক আছে। কথায় আছে ঐ যে আমার তুমি হাতাইলে

আমি নিজেই পার হব। আমি ইস্তফা দিলাম। অনেকে বলে তুমি কেন গান ছেড়ে দিলে। তকদিরে যা ছিল তা তকদিরেই আছে। আর কয়টা বছর। এখন বাইরে থেকে ডাক আসলেও যাই না। যাহ্‌।

নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য :

আমি আজকে এটা বলব, কালকে ফের আরেকটা আসবে, আমি এসব বিষয়ে মাফ চাইছি। আর এটা আমি পারব না। আমি ওকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব, কোন একটা বিষয় তুলে ধরতে পারব কিন্তু কারও দুর্নাম, বদনাম করতে পারব না। আমরা পারলে সুনাম করি, কিন্তু কোন দুর্নাম করি না। আমাদের বর্তমান সরকার, চেয়ারম্যান বা মেম্বার, যে সরকারই আসে এবং এ ধরনের কিছু করতে বলে, তাকে আমরা 'সরি' বলে দিচ্ছি।

শিল্পমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে গম্ভীরা গান :

হে নানা খুশির খবর একটা শুনেক না
উপজেলা হইল ভোলাহাট থানা
বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী নামটি সুলতান মাহমুদ
জ্ঞান বুদ্ধি আচার-ব্যবহারে লোকটি নানা অদ্ভুত নানা হে
বিদ্যুৎ উন্নয়নে এগিয়ে চলে সমুক পানে
অন্ধকারকে বাধা হেনে দেশে জ্বালায় আলোর বন্যা নানা হে

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আ. লতিফ সরকার রচিত গম্ভীরা গান :

দেশ বিজয়ের পরে নানা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
দেশের অবস্থা দেখে নানা কেঁদেছে তার প্রাণ। নানা হে
হায়রে বাংলার বঙ্গবন্ধু
হারিয়ে গিয়ে হয়েছি অন্ধ
হয়ে গেলাম হতভম্ব ॥

সরদার আ. লতিফ সরকার কর্তৃক রচিত ও পরিবেশিত গম্ভীরা গানসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তিনি একজন কুশলী গম্ভীরা শিল্পী। তাঁর রচনা ও পরিবেশনায় সামাজিক ক্ষুদ্রতর বিষয় যেমন – নিজ এলাকার স্কুলের জন্য অনুদান সংগ্রহ থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের একাধিক বিষয় যেমন – আনসার ভিডিপি দিবস, জন্মনিবন্ধন, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে গান রয়েছে। এছাড়াও একজন সামাজিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি বিভিন্ন দিবস উদযাপন, গণ্যমান্য ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে গম্ভীরা রচনা ও পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনায় এককভাবে কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে নয় বরং প্রত্যেক দলের

প্রশংসামূলক দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রাপ্তি, প্রত্যাশা উল্লেখপূর্বক প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গুণকীর্তন সম্বলিত একাধিক পয়ার সৃষ্টি করেছেন। তিনি কথাও বলেন অতি সতর্কতার সাথে। সরদার আ. লতিফ সরকারের সাথে আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রসঙ্গ অবতারণার দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করেও তা বোঝা সম্ভব হয়নি। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থান করলেও তাঁর যোগাযোগ ছিল স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সাথে। এসকল উচ্চপর্যায়ে সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা দ্বারা অনেকাংশে ছিলেন প্রভাবিত। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত একজন গম্ভীরা শিল্পী হবার। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশের ভেতর থেকে বেড়ে ওঠা কৃষক পরিবারের সন্তান হিসেবে রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত গম্ভীরা শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ দশজন মানুষের জন্য খুব বড় কোনো চাওয়া না হলেও সরদার আ. লতিফ সরকারের জন্য তা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানের বিষয়। এজন্য তিনি তাঁর সাধ্যমতো যোগাযোগ করেছেন। যখন নিষ্ফল হয়েছেন, নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ভাগ্যবিধাতার হাতে। গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে সরদার আ. লতিফ সরকারের এ দীর্ঘযাত্রার পেছনে একদিকে ছিল রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত গম্ভীরা শিল্পী হবার অদম্য স্পৃহা অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ছিল চরম বাস্তবতা। বাস্তবতার প্রতিকূলে এ গম্ভীরা শিল্পীর লড়াইচিত্র অনুসন্ধান করতে গেলে তাঁর এলাকার সামাজিক আদর্শগত পরিমণ্ডলও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সরদার আ. লতিফ সরকারের এলাকার সামাজিক আদর্শগত পরিমণ্ডল বিষয়ে আলোকপাত করা হলো –

সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক আদর্শগত পরিমণ্ডলঃ কুমিরজান গ্রাম, গোহালবাড়ি ইউনিয়ন, ভোলাহাট থানা

এখানকার সমাজব্যবস্থায় গ্রামে একজন করে মোড়ল ও সরদার রয়েছে। গ্রামের সবাই মিলে এদেরকে নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, সৎ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই মোড়ল ও সর্দার করা হয়। গ্রামের বিয়ে, শালিস সংক্রান্ত কাজ মোড়ল-সরদারেরাই করে থাকে। এদের মধ্যে আবার মোড়ল সম্মানের দিক থেকে বড় হিসেবে গণ্য হন। প্রতিটি গ্রামের মোড়ল ইচ্ছে করলে স্বেচ্ছায় মোড়লের দায়িত্ব থেকে অবসরগ্রহণ করতে পারেন। মোড়ল নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা হয় তিনি সম্মানিত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন কি না, সামাজিক দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারবেন কি না এবং সমাজে একটু প্রভাবশালী হতে হয়। গ্রামে কে নামাজ পড়ল কি পড়ল না, প্রতিদিন মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে না গেলেও সপ্তাহে জুমার নামাজ পড়তে গেল কিনা তা লক্ষ রাখা; যদি কেউ না যায় সেক্ষেত্রে তাকে মসজিদে যাবার তাগিদ দেয়া; রোজার সময় কেউ রোজা না রাখলে তাকে রোজা রাখার তাগিদ দেয়া; কোনো বিবাদ হলে তার মীমাংসা করা মোড়লের দায়িত্ব। এলাকার (জামাতের অন্তর্গত) কেউ মারা গেলে জামাতের পক্ষ থেকে তার দাফনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মোড়লের নেতৃত্বে জামাতীরা মৃতের পক্ষে এসকল কাজের উদ্যোগ

গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা মোড়লের দায়িত্ব।

গ্রামে সরদারের দায়িত্ব শরিয়াভিত্তিক কাজগুলো তদারকি ও দেখভাল করা। গ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো হানাফি মাযহাব দ্বারা পরিচালিত। হানাফি মাযহাবে ধর্মীয় নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করা হয়। যেমন – পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজভিত্তিক ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য মোড়ল ও সরদার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও সমাজ কাঠামোর আরেকটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হল জামাতভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। জামাত ব্যবস্থা মসজিদভিত্তিক। এক-একটি জামাতের অধীনে ৫০-১০০-১৫০টি পরিবার রয়েছে। প্রতি জুম্মায় জামাতের অধীনস্ত পরিবারগুলো থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কমপক্ষে ১০০ গ্রাম মুষ্টি চাল বা তদূর্ধ পরিমাণ চাল সংগ্রহ করে থাকে। সংগৃহীত এই চাল ও অর্থ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং ইমামের ব্যয়ভার বহন করা হয়। মসজিদে ইমামের ঠিকমতো নামাজ পড়ানো, মুয়াজ্জিনের আযান দেয়া, তাদের ব্যয়ভার বহনের বিষয়গুলো তদারকির কাজ সাধারণত সরদার করে থাকেন।

এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। কুমিরজান গ্রামের ৮০ শতাংশ লোক কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল, পাঁচ শতাংশ চাকুরি এবং বাকি ০.২ শতাংশ ব্যবসা ও অন্যান্য শ্রমভিত্তিক কাজের সঙ্গে জড়িত।[১] এখানকার প্রধান ফসল হিসেবে আম, ধান, বাঁশ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও, রেশমগুটি থেকে সুতা তৈরির কাজও মহিলাদেরকে করতে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়িতে গরু রয়েছে। যাদের একটু বেশি জমি আছে তাদের বাড়িতে গরুরগাড়ি রয়েছে। খড়সহ ধান আনা-নেওয়ার কাজ গরুর গাড়িতেই করে থাকে। এলাকার দো-ফসলি জমিতে চাষাবাদের সময় কৃষকদের মজুরি সর্বোচ্চ ৩০০-৩২০ টাকা পর্যন্ত উঠে থাকে। এছাড়া বছরের অন্যান্য সময় কৃষকদের সাধারণ মজুরি ১৮০-২৫০ টাকার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে। যে সকল পরিবারের নগদ ২০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা রয়েছে তারা সাধারণত গরু কিনে কিছুদিন লালন-পালনের পর একটু বেশি দাম পেলে বিক্রি করে অথবা এক হাট থেকে ক্রয় করে অন্য হাটে বিক্রি করে থাকে।

শহর ও গ্রামপর্যায়ের গম্ভীরা শিল্পীদের বাস্তবতা ও জীবনদর্শন

রাজশাহী সদরের মাথুল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা মো. বকুল প্রধানত রাজশাহী থিয়েটারের সদস্য। মূলত তিনি একজন নাট্যকর্মী। বর্তমানে মাথুল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে তথ্য প্রচারণার দ্বারা জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে গম্ভীরা গান পরিবেশন করছেন। গম্ভীরা গানকে পেশা হিসেবে নেবার ফলে রাজশাহী থিয়েটারে এখন পূর্বের মতো সময় দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। পুরো সময়টা তিনি মাথুল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে গম্ভীরা পরিবেশনে ব্যস্ত থাকেন। রাজশাহী থিয়েটারের সদস্য থাকাকালীন তিনি গড়ে তোলেন নাট্যজগতের তৃণমূল থেকে

জাতীয় পর্যায়ের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের নাট্যব্যক্তিত্ববর্গের সাথে তাঁর রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। মো. বকুল অকপটে স্বীকার করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জাতীয় নাট্যব্যক্তিত্ববর্গের প্রতি। জাতীয় পর্যায়ের এঁদের সাথে তাঁর পরিচিতির কারণেই তিনি গম্ভীরা গান পরিবেশনকে পেশা হিসেবে নিতে সক্ষম হয়েছেন। গম্ভীরা করে তিনি নিজের জীবনকে একজন প্রকৃত গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন – এতেই তিনি খুশি। তিনি দাবি করে বলেন, তাঁর দেশের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ কিন্তু সেখানে জ্ঞাতি ছাড়া পরিবার পরিজনদের কেউ-ই থাকেন না। এটা বলে তিনি হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পীবৃন্দ গম্ভীরা গান পরিবেশনা বিষয়ে আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষা-প্রকৃতি নিয়ে যে কুলীন মনোভাব পোষণ করেন, তিনি সেই সীমাবদ্ধতার বাইরে। তিনি প্রতি গম্ভীরা গান পরিবেশনে ৫০০০ টাকা গ্রহণ করে থাকেন। উক্ত টাকা তিনি তাঁর দলের সদস্যদের মধ্যেসমানভাবে বণ্টন করে থাকেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে রাজশাহী সদরে তাঁর নিজস্ব চারতলা পাকা বাড়ি রয়েছে। গম্ভীরা দলের জন্য একটি জীপ গাড়ি রয়েছে। এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক গম্ভীরা শিল্পী বকুল বলেন, 'বড় ছেলেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি। আর মেয়েটা বিএসসি পরীক্ষার্থী। গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে। মেয়েকে নিয়েই তিনি গম্ভীরা গান করেন। তাঁর এই শিল্পীজীবনে তেমন কোনো চাওয়াপাওয়া নেই। আসলে ব্যস্ততা এতো বেশি যে, এসব বিষয় নিয়ে ভাবার মতো সময়ও নেই। যে যখন ডাকছে, কাজ করে দিচ্ছি।' অপরদিকে, ফাইজুর রহমান মানি স্থায়ীভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরের হাসপাতাল রোডের অধিবাসী। তাঁর বাল্য-কৈশোর কাল থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংসার ও শিল্পীজীবনের আজ অবধি এ শহরেই (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) অবস্থান করছেন। রাজশাহীর গম্ভীরা শিল্পী বকুলের মতো তিনি আর্থিকভাবে বিত্তবান না হলেও তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের নেতৃত্বদানকারী গম্ভীরা দল হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। গম্ভীরা গবেষক মাযহারুল ইসলাম তরুর সাথে রয়েছে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এছাড়াও দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথেই তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। মানসিকভাবেই রাজশাহী সদরের দলগুলো ফাইজুর রহমান মানির দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ। তাঁর অভিযোগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ যে সকল দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তার ভেতর গম্ভীরা গান অন্যতম। এ সকল অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর কুলীন গম্ভীরা শিল্পীর মনোভাব প্রকাশ পায়। রাজশাহী সদরের দলের থেকে তাঁর দল পরিচালনাও অনেক জটিল। গম্ভীরা গান পরিবেশনের লব্ধ অর্থ দলের অন্য সদস্যদের সাথে বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি শ্রেণি-বিভাজনকে গুরুত্ব দেন। নানা এবং নাতির জন্য সমানভাগে বরাদ্দ রেখে বাকি অংশ সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে নেন। যেমন, তিনি প্রতি গম্ভীরা গান পরিবেশনে সর্বনিম্ন ৭০০০ টাকা গ্রহণ করে থাকেন। এর ভেতর তিনি নিজের জন্য ৩০০০, নানার জন্য ২ হাজার এবং অন্য চারজন সদস্যকে বাকি ২০০০ ভাগ করে দেন। নিজ দলের সদস্যদের সাথে অর্থ বিনিময়ে

অসমতার অনুশীলন করলেও দীর্ঘমেয়াদি কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চুক্তিপত্র দেখার জন্য দাবি করেন; যেন তাকে আসল চুক্তিপত্র দেখানো হয়। গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে এলাকার প্রতিপত্তি, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফাইজুর রহমান মানি কিছু প্রকাশ না করলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জের হাসপাতাল রোডে অবস্থানকারী অপর এক মহিলা গম্ভীরা শিল্পী ছাবিনা ইয়াসমিনের বর্ণনায় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ছাবিনা ইয়াসমিন কারও নাম উল্লেখ না করেই বলেন,

> আমি মহিলা হিসেবে গম্ভীরা করি, এটা এখানকার (মহল্লা) অনেকেরই পছন্দ নয়। আমি আর আমার বোন ছাবিনাকে নিয়ে গম্ভীরা করি, এতে দোষের কী আছে? গম্ভীরা আমাদের ঐতিহ্য, দেশীয় সম্পদ। চাঁপাইনবাবগঞ্জে একমাত্র আমরাই প্রথম মহিলা গম্ভীরা দল শুরু করেছিলাম। এলাকায় আরেকটি পুরুষ গম্ভীরা দল আছে। আমরা গম্ভীরা দলের গান শুরু করায় তারা আমাদেরকে হয়তো হুমকি মনে করছে। যে কোনো কারণেই হোক তারা আমাদেরকে মেনে নিতে পারছে না। এখানে আমার একটা নাচের স্কুল আছে, সেখানে আমি বাচ্চাদের নাচ (নৃত্য) শেখাই। মহল্লার লোকদেরকে দিয়ে সেই বাচ্চাদের সম্পর্কে আজেবাজে মন্তব্য করতেও তারা ছাড়ে নাই।(সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ছাবিনা ইয়াসমিন, হাসপাতাল রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নভেম্বর-২০০৯, অক্টোবর-২০১৩, মার্চ-২০১৪)

প্রাথমিকভাবে গম্ভীরা শিল্পীদের চলমান বাস্তবতার একটি সাধারণ জীবনধারা মনে হলেও এর অন্তরালে প্রতিমুহূর্তেই চলছে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও ক্ষমতা-বিন্যাসের এক অদৃশ্য লড়াই যা কখনো কখনো আমাদের সামনে ধরা পড়লেও বেশিরভাগ সময়েই থেকে যায় সমাজ বাস্তবতার অন্তরালে। তুলনামূলকভাবে, ভোলাহাটের গম্ভীরা শিল্পী সরদার আ. লতিফ সরকারের জীবন-বাস্তবতার লড়াইয়ের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতার জায়গাটা মোটেও বস্তুগত নয় বরং সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার। এলাকা ও অবস্থানগত দিক থেকে সরদার আ. লতিফ সরকার নিজ এলাকার সমাজপ্রধান, নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন। যেখানে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান যথেষ্ট। সেই তুলনায় রাজশাহী সদরের গম্ভীরা শিল্পী বকুল এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের ফাইজুর রহমান মানি সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের দিকে সরদার আ. লতিফ সরকারের থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। গ্রামে অবস্থান করলেও তাঁর আবাদি জমি ও বাগানবাড়ি থেকে যে ফসল পেয়ে থাকেন তাতে তাঁর পরিবারের সকলের সারা বছরের খোরাকি হয়ে গিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে যা দিয়ে তিনি সন্তান-সন্ততিসহ অন্য আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রয়োজনমতো খরচ করতে পারেন। যদিও রাজশাহী সদর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের গম্ভীরা শিল্পীদের নগরকেন্দ্রিক সুবিধা ও জীবনভারের ব্যয় গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। সেই তুলনায়, নগরকেন্দ্রিক গম্ভীরা শিল্পীদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকতে হয়, যা সরদার আ. লতিফ সরকারকে করতে হয় না। তিনি বরাবর রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত গম্ভীরা শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী মানেই অধিক

সম্মান, সমস্ত দেশজুড়ে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি। বেতারের শিল্পী হবার বাসনা ছিল তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা, যে বিষয়টি আজ অবধি তাঁর কাছে অতৃপ্ত থেকে গেল। অথচ, রাজশাহী সদরের বকুল এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফাইজুর রহমান মানির নিকট রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত গম্ভীরা শিল্পী হওয়াটা যেন একটা সাধারণ ব্যাপার। একাধারে সাত দিন ফাইজুর রহমান মানির সাথে গম্ভীরা বিষয়ক মাঠকার্য সম্পাদনকালে একবারও প্রকাশ করেননি যে তিনি রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত গম্ভীরা শিল্পী। মাঠকার্য শেষে ফেরার পথে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল 'তিনি রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী কি না?' তিনি সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, সেই ৯১ সাল থেকে রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী। প্রতি মাসে কম করে হলেও ১০-১৫ টা গম্ভীরা করা বাধ্যতামূলক। বেতার থেকেই গম্ভীরা করার জন্য ডাক পড়ে। প্রথম দিকে গানের খসড়া জমা দিতে হলেও বর্তমানে তা আর দিতে হয় না। আগে থেকেই বেতার কেন্দ্র থেকে গম্ভীরা পরিবেশনার বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয় ফলে কেন্দ্রে গিয়ে সরাসরি রেকর্ডিংয়ে অংশ নেয়া সম্ভব হয়। নগরকেন্দ্রিক গম্ভীরা শিল্পীদের কাছে যা একটি সাধারণ ব্যাপার, গ্রামের একজন সাধারণ গম্ভীরা শিল্পী লুৎফর রহমানের কাছে তা আকাশতুল্য যেহেতু তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সরদার আ. লতিফ সরকারের এই আকাঙ্ক্ষা মানসিক। অনুরূপভাবে, রাজশাহী সদরের গম্ভীরা শিল্পী বকুল এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিল্পীর জীবনযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রণোদনার বিষয়টি একেবারেই মানসিক। এদের কেউ-ই একবারও কোনো বস্তুগত বিষয়ের অভাবের কথা বলেননি যার কারণে বেঁচে থাকা তাঁর জন্য কষ্টকর হচ্ছে।

আলকাপ ও গম্ভীরা গানে সাধারণ হেজিমনি ও প্রতিরোধ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু অথবা বিষয় সম্পর্কে আলকাপ গানে যেরকম প্রত্যক্ষ এবং কঠোর সমালোচনামূলক গান পরিবেশন করতে দেখা যায়, গম্ভীরা গানে সেই ধরনের সমালোচনামূলক পরিবেশনা একেবারেই অনুপস্থিত। যে দুই-একটা সমালোচনামূলক বা কটাক্ষ উক্তিমূলক গান পাওয়া যায়, তাও গানের সমস্ত অংশে রূপকার্থে তুলে ধরা হয়। এ কারণে গম্ভীরা গানে উচ্চবর্গের মতাদর্শিক আধিপত্য বা হেজিমনি ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ চিত্র অপেক্ষাকৃত জটিল এবং বিচিত্র। এখানে হেজিমনি (Hegemony) শব্দটি সাধারণভাবে উচ্চবর্গের অধীন হিসেবে নিম্নবর্গের প্রতি ক্ষমতা বা বল প্রয়োগ না করেও কৌশলে যে প্রক্রিয়ায় সম্মতি আদায় করে নেয়া হয় (Scott, James C., 1985 : 39) অথবা উচ্চবর্গের মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করার বিশেষ প্রক্রিয়া বা কৌশলকে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে (Buttigieg, 1995 : 7)। গ্রামশি তাঁর 'Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci'- এ হেজিমনি সম্পর্কে বলেন, "Gramsci's ideas were far-reaching because he warned of the limited possibilities of direct revolutionary struggle for control of the means of

production; this 'war of attack' could only succeed with a prior 'war of position' in the form of struggle over ideas and beliefs, to create a new hegemony" (Buttigieg, 1995 : 7). গ্রামশির চিন্তা আরও অধিকতর দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন। তিনি পূর্বে সতর্ক করেছিলেন যে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারা উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সফলতার সম্ভাবনা খুবই সীমিত; 'আক্রমণের যুদ্ধ' সফলতা লাভ করে শুধুমাত্র পূর্বেকার কর্তৃপক্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিন্তু 'অবস্থা পরিবর্তনের যুদ্ধ' হল চিন্তা ও বিশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ যা দীর্ঘমেয়াদি এবং নতুন একটি হেজিমনি সৃষ্টির উপায় হিসেবে কার্যকর। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চবর্গ সমাজকে একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করে (Buttigieg, J. A., 2005 : 44)। এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সাস্কৃতিক কার্যক্রমভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্চ, প্রকাশনা সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠান সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মানুষের আচরণের প্রকৃতি ও প্রত্যাশা সৃষ্টিতে জোর দেয়। গ্রামশি সামাজিক এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'সুশীল সমাজ' বলে অভিহিত করেছেন যারা বরাবর উচ্চবর্গের পক্ষে কাজ করে (Buttigieg, J. A., 2005 : 6)। 'সুশীল সমাজ' হলো একটি সামাজিক স্তর যার দ্বারা রাষ্ট্র হেজিমনি পরিচলনা ও নিয়ন্ত্রণ করে; একটি সামাজিক শৃঙ্খলা যেখানে জনসাধারণকে উচ্চবর্গ সমাজে কীভাবে চলতে হবে, কথা বলতে হবে, কী রকম আচরণ করতে হবে – এসকল বিষয়ে ধারণা প্রদাণ করে (Femia, J. V., 1981 : 24)। উচ্চবর্গ দ্বারা সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় নিম্নবর্গের সম্মতি আদায়ের এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। এ প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্গকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করলেও কখোনোই তারা চিন্তার দাসত্বের বাইরে যেতে পারে না। এটা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত চলমান একটি প্রক্রিয়া (Buttigieg, J. A., 1995 : 7)। 'রাজনৈতিক সমাজ' মূলত রাষ্ট্রীয় শোষণ কাঠামোর গঠনচিত্র। এটি প্রকৃতপক্ষে, 'ক্ষমতা অধিগ্রহণ' এবং যারা অস্বীকৃতি জানায় তাদের সম্মতি আদায় ও বাধ্য করার একটি যন্ত্র হিসেবে কাজ করে; যেমন – সেনাবাহিনী, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী, এলিট ফোর্স ইত্যাদি। উচ্চবর্গ যেখানেই সম্মতি আদায় করতে ব্যর্থ হয় সেখানেই শক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিম্নবর্গের সম্মতি আদায়ের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। গম্ভীরা গানে রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ের গম্ভীরা শিল্পী বকুলের সাথে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সকল সাংস্কৃতিক নাট্যব্যক্তিত্বের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এসকল নাট্যব্যক্তিত্ব উচ্চবর্গ এবং সুশীল সমাজের অন্তর্গত। গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে তিনি অধিকতর সুবিধা লাভের আশায় প্রতিনিয়তই এসকল সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন, এমনকি তিনি নিজেও সুশীল সমাজের সভ্যদের মতোই বিনয়ী আচরণ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে তিনি কাউকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। সার্বক্ষণিক সদাহাস্যোজ্জ্বল বকুল জানান, 'সম্ভব হলে অপরের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি। কখনও নিজের ক্ষতি হলেও অন্যের জন্য সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই।' নিম্নবর্গের চেতনা বিশ্লেষণে গম্ভীরা শিল্পী বকুলের এই উদার মানসিকতার একটি

ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় : 'Rather than speaking of an essential antagonism, it would be better to speak of an 'agonism'-of a relationship that is at the same time mutual incitement and struggle; less of a face-to-face confrontation that pralyzes both sides than a permanent provocation' (Foucault, Michel, 2001: 342). নিম্নবর্গ বিনা প্রশ্নে উচ্চবর্গের মতাদর্শ ও প্রভাবকে মেনে নিয়ে সে নিজের অবস্থার পরিবর্তনে তৎপর হয়। নিজের অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা ভবিষ্যতে জোরালোভাবে প্রতিরোধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে অর্থাৎ বিনাবাক্যে উচ্চবর্গের মতাদর্শ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে আসলে প্রতিরোধের ক্ষেত্রই প্রস্তুত করে (Scott, James C., 1985 : 36)। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গ অবচেতনভাবে উচ্চবর্গীয় মতাদর্শের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে (রতন খাসনবিশ [সম্পাদিত], ২০০৯ : ১৭১)। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পী ফাইজুর রহমান মানিও ফোকলোর গবেষক হিসেবে খ্যাত ড. মাযহারুল ইসলাম তরুর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখেন। শুধু মাযহারুল ইসলাম তরুই নয়, তাঁর সাথে জাতীয় পর্যায়ে সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তিনি স্থানীয়ভাবে জেলা পর্যায়ের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থার কর্তা-ব্যক্তিদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলেন। যেহেতু, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বেসরকারি উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণির কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই উচ্চবর্গের অন্তর্গত। সে কারণে দেখা যায়, গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে রাজশাহী সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং ভোলাহাটের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সরদার আ. লতিফ সরকার– এদের সকলেই উচ্চবর্গের জন্য কাজ করছেন। তাঁদের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়তই গম্ভীরা গান পরিবেশন করে চলেছেন। তাঁদের চাহিদা অনুসারে গম্ভীরা গানের আসর দুই-আড়াই ঘণ্টার স্থলে বর্তমানে ১৫ মিনিট সময়ে এসে ঠেকেছে। গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে এদের প্রত্যেকেই নিজেদের চেতনা-বোধ ভুলে গিয়ে উচ্চবর্গের পছন্দ ও চাহিদা অনুসারেই কাজ করে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে গম্ভীরা গানকে পেশা হিসেবে নিতে হলে উচ্চবর্গের মতাদর্শ অনুযায়ী চলা ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না। শরীরীভাবে নিম্নবর্গের উপর নয় বরং তাঁদের চেতনায় উচ্চবর্গের হেজিমনি এমনভাবে বাসা বাঁধে যে তারা তাঁদের নিজস্ব চেতনা ভুলে উচ্চবর্গের মতাদর্শে তাড়িত হয়ে কর্মধারায় লিপ্ত হন। উচ্চবর্গের হেজিমনির অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে সরদার আ. লতিফ সরকারের ক্ষেত্রে। তিনি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানগত দিক থেকে একজন ধনী কৃষক এবং স্থানীয়ভাবে সমাজপ্রধান, সমাজ সরদার হিসেবে নিযুক্ত আছেন। রাজশাহীর বকুল এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা শিল্পী ফাইজুর রহমান মানিসহ যে কোনো গম্ভীরা শিল্পীর তুলনায় তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত দিক থেকে উঁচু পর্যায়ে অবস্থান করছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি মানসিকভাবে নিজেকে জীবনযুদ্ধে একজন পরাজিত গম্ভীরা শিল্পী মনে করেন। তিনি মনে করেন, রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী হতে

পারলেই তাঁর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হতো। ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরসহ, রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন এলাকাতে অত্যন্ত সুনামের সাথে তিনি ও তাঁর দল গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন। তাঁর শিল্পীজীবনের ষোলো-আনাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা পুষ্ট। যখনই তিনি কোনো গম্ভীরা গান পরিবেশন করতে গেছেন, তখনই সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের সুবিধা লাভের আশায় তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাকে রাজশাহী বেতার এবং ঢাকা টেলিভিশনের শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং কিছুদিন পর বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। এর মধ্যে আবার নতুন কোনো সরকারি কর্মকর্তা এসেছেন। তিনিও নিজের পদোন্নতির আশায় নিজ কার্যক্রমকে ফলাও করে প্রকাশ করার জন্য সরদার আ. লতিফ সরকারকে ব্যবহার করেছেন এবং পদোন্নতি নিয়ে অন্যত্র গমন করেছেন। কিন্তু সরদার আ. লতিফ সরকার যে আশায় বুক বেঁধেছেন, সে স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেছে। নিম্নবর্গের তত্ত্ব অনুসারে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সকলেই উচ্চবর্গের অন্তর্গত। তাদের মতাদর্শের প্রভাবে তিনি এতটাই হেজিমোনাইজড হয়েছেন যে, তাঁর অন্য সকল অর্জন যেন শুন্যে এসে মিলেছে। তিনি এখনও আশা বুক বেঁধে আছেন, হয়তো কেউ এসে এক সময় তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করবেন। সরদার আ. লতিফ সরকার প্রচণ্ডভাবে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত একজন গ্রামীণ সমাজের গম্ভীরা শিল্পী। শিল্পী হিসেবে তাঁর জীবনবোধ বা মূল্যায়ন উচ্চবর্গের হেজিমনির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। এছাড়া সরদার আ. লতিফ সরকার গভীর রাতে দোতারা বাজানোর সময় তাঁর আম্মা নিষেধ করলে তিনি তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেন। এরপর পরিবারবর্গ থেকে যখন গম্ভীরা না করার জন্য অনুরোধ করা হল, তখন তিনি নিজ এলাকাতে গম্ভীরা গান করা ছেড়ে দেন এবং নিজ এলাকার বাইরে গিয়ে গম্ভীরা গানে অংশ নেন। পরবর্তীকালে তিনি গম্ভীরা করার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে গান লিখে দেন এবং প্রশিক্ষণ দেন – এসকল উদ্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রেই লতিফ সরকারের প্রতিরোধের সক্রিয় ভূমিকা কাজ করে। সমাজের মুখের উপর বলতে না পারা কথাগুলো তিনি স্কুলের ছেলেমেয়েদের মুখ দিয়ে বলানোর সুযোগ নেন। উপরন্তু, দেখা যায়, লতিফ সরকারের পারিবারিক ক্ষেত্রসমূহ সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবার তথা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল্যবোধের ধুয়া তুলে সাধারণ মানুষকে উচ্চবর্গের দ্বারা অনুশাসিত সমাজের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করে (Scott, James C., 1985 : 41)। সরদার আ. লতিফ সরকারের ক্ষেত্রে যদিও তিনি স্থানীয়ভাবে সমাজের উঁচু তলার মানুষ কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন পরিচালনাকারী শ্রেণি উচ্চবর্গের পক্ষে কাজ করে এবং সেই জায়গাতে সরদার আ. লতিফ সরকার ধর্মীয় নিয়মনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ একজন সাধারণ মানুষ। সমাজে থাকতে হলে তাকে সমাজের ঐ অনুশাসন মেনে চলতেই হবে (Scott, James C., 1985 : 39)। এখানে মূল্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষার কারসাজিতে এখানে যে কেউ-ই নিম্নবর্গ হিসেবে অপরাধীর কাঠগড়ায় চলে আসতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিম্নবর্গের তত্ত্ব অনুসারে চার্চ/গীর্জা, মসজিদ, মাদ্রাসা, প্যাগোডা

ইত্যাদি ধর্মীয়-প্রতিষ্ঠান সামাজিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের গবেষক জেমস সি. স্কটের মন্তব্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন,

> ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হেজিমনির কারণে প্রকৃতপক্ষে শোষিতের দল বা নিম্নবর্গ এটাকে সামাজিক আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়। এই অবস্থা সমাজের সুবিবেচনামূলক অংশ হিসেবেও গৃহীত হয়। এই নির্জীবতাকে নিদেন পক্ষে বলা যেতে পারে সমাজ প্রক্রিয়ার 'ফ্যাটালিস্টিক একসেপট্যান্স' (Fatalistic Acceptance)। নৈতিকভাবে খারাপ বা বেঠিক এই ক্রিয়াকে মার্কসবাদে বলা হয় 'মিস্টিফিকেশন' (Mystification) বা 'ফলস কনশাসনেস' (False Consciousness)। (Scott, James C., 1985: 41) [লেখক দ্বারা অনূদিত]

সমাজে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি সাধারণ সামাজিক আদর্শগত অবস্থা হিসেবে মেনে নেয়। এর ফলে, ব্যক্তি 'মানবিক মূল্যবোধের বিচারে একটি সুবিধা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে'– এই সচেতনতাবোধ হারিয়ে ফেলে এবং এই অবস্থাকেই পরবর্তী পর্যায়ে তার নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। ঠিক যেমনভাবে সরদার আ. লতিফ সরকার ধর্মীয় পরাকাষ্ঠার বেড়াজালে নির্মিত দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে শেষ পর্যায়ে নিজ এলাকায় গম্ভীরা গান পরিবেশন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– এটা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি প্রথমে সমাজের ইমামের (মেয়ে জামাই) নিষেধাজ্ঞা মেনে না নিলেও পরে নিজের মেয়ের কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেন। (সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সরদার আ. লতিফ সরকার, অক্টোবর, ২০১৩)। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি পারিবারিক বিষয়গুলোকে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করে যে কোনোভাবেই ব্যক্তি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। এই বিচারে লতিফ সরকারও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে একজন অসহায় মানুষ। অন্যদিকে, তাঁর বড় মেয়ে (ইমামের স্ত্রী) ঘরে বসে রেশমগুটি থেকে সুতা ছাড়ানোর কাজ করেন (Muhammed A. Malik (editor), 2005 : 122)। প্রতিদিন গৃহস্থালির অন্য কাজের পাশাপাশি রেশম সুতা ছাড়ানোর কাজ করে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এখানে সমাজ একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। এই বাধাগুলো যদিও পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে একজন মানুষকে খুব ছোটবেলা থেকেই শিখিয়ে এমনভাবে মজ্জাগত করে দেয়া হয় যাতে সে এর বাইরে অন্যকিছু ভাবাকে অন্যায় বা পাপ মনে করে অথবা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া বা শাস্তি পেতে হবে – এরূপ মনে করে (Scott, James C., 1985 : 41) [লেখক দ্বারা অনূদিত]। উচ্চবর্গের মতাদর্শভিত্তিক অনুশাসনের বিপরীতে সমাজে যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, অথবা নিজস্ব ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে এই অনুশাসনের প্রক্রিয়া 'সামাজিক আদর্শ' হিসেবে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে এবং সমাজকে কোনো ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঝুঁকি

থেকে শঙ্কামুক্ত করতে দীর্ঘকাল ধরে এই প্রক্রিয়া চলে আসছে যাতে এই প্রক্রিয়া সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি সাধারণ প্রক্রিয়া বলে মনে হয়। সমাজের সাধারণ মানুষকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন থেকে বিরত রাখার কৌশলের উপায় সম্পর্কে জেমস সি. স্কটের দেয়া বিবৃতি উল্লেখযোগ্য –

> 'পার্টি টাস্ক' (Party Task) হলো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে কম গুরুত্ব দিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চিন্তাকে থামিয়ে দেয়া বা বাধাগ্রস্ত করা। নিম্নশ্রেণিকে নিষ্ক্রিয় করতে এই ধরনের ব্যাখ্যা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে যেখানে সমাজস্থিত বিভিন্ন শ্রেণি গোঁড়া জাতিভেদ বা ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা তাড়িত। সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয়তার আরেকটি বিকল্প ব্যবস্থা হল সমস্ত দেশব্যাপী বাধ্য করার জবরদস্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয় যেখানে কৃষক সমাজের বিশ্বাস মূল্যবোধ কোনো গুরুত্ব পায় না (Scott, James C., 1985 : 40)। [লেখক দ্বারা অনূদিত]

নিম্নবর্গের অন্তর্গত শ্রেণির মধ্যে উচ্চবর্গের হেজিমনির বিপরীতে সাধারণ প্রতিরোধ হিসেবে 'কাউন্টার হেজিমনি' (Counter Hegemony) কৌশল ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'কাউন্টার হেজিমনি' (Counter Hegemony) হিসেবে বিভিন্ন ধরনের শব্দ করা, জুতা বা স্যাণ্ডেল দিয়ে মাটিতে শব্দ করা, লুঙ্গি খুলে ফেলা, পেছন থেকে অথবা আড়ালে থেকে অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করা – এরকম বিভিন্ন প্রতীকী আচরণসমূহ সাধারণত 'কাউন্টার হেজিমনি' হিসেবে গণ্য করা হয় (Heywood, Andrew, 1994 : 85)। উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের সাধারণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কাউন্টার হেজিমনি উচ্চতর বিকল্প প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। কাউন্টার হেজিমনির মাধ্যমে ওই সমাজের স্থানিক জ্ঞান, সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নির্ভর করে (Heywood, Andrew, 1994 : 101)। প্রতিরোধের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে জেমস সি. স্কটের মন্তব্য দিকনির্দেশনাপূর্ণ। তিনি বলেন –

> Resistance is a subtle form of contesting 'public transcripts' by making use of prescribed roles and language to resist the abuse of power – including things like 'rumour, gossip, disguises, linguistic tricks, metaphors, euphemisms, folktales, ritual gestures, and anonymity. These methods are particularly effective in situations where violence is used to maintain the status quo, allowing 'a veiled discourse of dignity and self-assertion within the public transcript… in which ideological resistance is disguised, muted and veiled for safety's sake'. These forms of resistance require little coordination or planning, and are used by both individuals and groups to resist without directly confronting or challenging elite norms. (Scott, James C., 1985 : 137)

প্রতিরোধের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত থাকে। বেশিরভাগ প্রতিরোধচিত্রে উচ্চবর্গের প্রতি নিম্নবর্গের খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের অবমাননা বা অবজ্ঞাসূচক মনোভাব প্রকাশ পায়। ক্ষমতাহীনদের সাধারণ অস্ত্র যেমন – পা ঘষা, একবার দেখা দিয়ে গা ঢাকা দেয়া, মিথ্যা নালিশ বা বদনাম ছড়ানো, ছিঁচকে চুরি, দেখেও না দেখার ভান করা, পরিকল্পনা করে কোনো কিছু পুড়িয়ে ফেলা বা ক্ষতিসাধন করা ইত্যাদি। এসকল ব্রেখটিয়ান শ্রেণিদ্বন্দ্বের কিছু কাঠামোগত চিত্র আছে যা সাধারণ বলে বিবেচিত হয় (Scott, James C., 1985 : 29)। তাদের কোনো পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের দরকার পড়ে না। একক ব্যক্তি হিসেবে প্রায় ক্ষেত্রেই সে নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করে এবং গতানুগতিকভাবে উচ্চবর্গের বিপরীতে কোনো প্রতীকী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায়। প্রতিরোধের সাধারণ প্রকৃতি বুঝতে গেলে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিরোধের আগে ও পরে নিম্নবর্গের অবস্থা বোঝা দরকার (Scott, James C., 1985 : 29)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সক্রিয় ও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করতে পারে। যদিও এগুলো খুবই ছোট ছোট আকারে, সূক্ষ্মতার সাথে প্রবঞ্চনার দ্বারা ঘটে থাকে (Scott, James C., 1985 : 31)। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিরোধ সাধারণ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিক নাটকীয় বিভিন্ন রূপ দেখায়। এদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকে উচ্চবর্গের দ্বারা সৃষ্ট কোনো ঘটনার পূর্বেই দোষারোপ করা এবং নিজেকে সকল ধরনের দায় থেকে মুক্ত রাখা অথবা অস্বীকার করা। প্রতীকী ও অস্বীকৃতিমূলক লক্ষ্য পূরণে পরোক্ষ বা অস্পষ্ট রূপে 'প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিরোধ' 'বৈপ্লবিক প্রতিরোধ' থেকে আলাদা। বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুসংগঠিত এবং অনেক পূর্বকাল থেকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে চলে (Scott, James C., 1985 : 33)।

চলমান নেতৃত্ব ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি নিম্নবর্গের অবজ্ঞাসূচক আচরণ প্রতিপক্ষকে আরও সংগঠিত (Organized) ও কঠোর হতে সচেতন করে। যেমন – কোনো প্রতিষ্ঠান হতে অব্যাহতি নেয়া, ইস্তফা দেয়া, এগুলো ছোট ছোট গরিলা ক্যাম্পেইনের মতো। এগুলোর জন্য কোন ন্যূনতম সমন্বয়ের দরকার হয় না। তাদের ব্যক্তি পর্যায়ের পা ঘর্ষণ, এড়িয়ে চলার বিষয়গুলো জনপ্রিয় প্রতিরোধমূলক রীতিতে পরিণত হয়ে বার বার করার তাগিদ দেয়। সমাজে প্রতিরোধমূলক কার্যের একটি রূপক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন – ভোলাহাটে কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্যে লুঙ্গি খুলে তার সামনে ঠিক করে পরিধান করা একটি অলিখিত অপমানমূলক রেওয়াজ হয়ে গেছে। কেউ যদি লুঙ্গি খুলে আবার ঠিক করে পরে তাহলে আশেপাশে উপস্থিত যারা থাকেন তারা ধরে নেন, যিনি লুঙ্গি খুলেছেন, তিনি কারও প্রতি অসম্মানজনক কাজটি করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরোধ প্রকৃতিসমূহ মূলত স্থিত শ্রমের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিশোধের প্রচণ্ডতা বা প্রতিশোধের স্পৃহার প্রতি নিজের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যা ক্রমান্বয়ে সামাজিকভাবে প্রচলিত রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় (Scott, James C., 1985 : 34)। রাজশাহী সদরের গম্ভীরা শিল্পী বকুলের সাথে আলোচনা করে যেটা বোঝা যায়, তা হলো, তাঁর সাথে কারও কোনো বিরোধ নেই। তিনি নিজেকে কারও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। তিনি মনে করেন,

তাঁরও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি উচ্চবর্গসহ (স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নাট্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব) সকলের সাথেই সদ্ভাব বজায় রেখে চলেন (সাক্ষাৎকার গ্রহণ : বকুল, মাথুল থিয়েটার, রাজশাহী সদর, অক্টোবর ২০১৩)। তাঁর সদ্ভাব বজায় রাখার এই আচরণ সমাজে টিকে থাকার লড়াইয়ের অন্যতম কৌশল 'ফলস কনশাসনেস' (False Consciousness) হিসেবে চিহ্নিত।

> সচেতনতা সম্পর্কিত অর্থপূর্ণ কিছু সরাসরি না বলে অন্যভাবেও বলা যায়; যেমন – উচ্চবর্গের দমন, নিপীড়ন, শোষণের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং সরাসরি প্রতিরোধকার্য থেকে বিরত থাকা। এই ক্রিয়া বা কৌশলসমূহ (False Consciousness) নির্ভর করে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মূল্যবোধের প্রতীকী সাদৃশ্যের ওপর। উচ্চবর্গের নির্দেশিত সকল দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক নিয়ম হিসেবে নিম্নবর্গ মেনে নেয়। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্গ প্রতিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য উচ্চবর্গের মতাদর্শকে মেনে নেয়ার ভান করে সে নিজেকে তৈরি করে (Scott, James C., 1985: 39)।[লেখক দ্বারা অনূদিত]

এই প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, নিম্নবর্গের বা অধীন সদস্য উচ্চবর্গের মতাদর্শকে গ্রহণ করার ভান করে কিন্তু প্রকৃপক্ষে সে তাঁর নিজস্ব আদর্শ ভেতরে লালন করে উচ্চবর্গের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুবিধা আদায় করে নেয়। নিম্নবর্গ হিসেবে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়ে প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রতিরোধ যথার্থ হলো কিনা সে বিষয়গুলো চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিরোধকারীর কিছু বস্তুগত চাহিদা পূরণের প্রয়োজন থাকে; যেমন – নিরাপত্তা, খাদ্য, জমি আয়, সামাজিক অবস্থান এবং এগুলো নিশ্চিত করার জন্য তারা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর প্রতিরোধের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। সমাজের বিশেষ শ্রেণির প্রতি ইঙ্গিত করে সরদার আ. লতিফ সরকারের অস্ফুট শব্দে উচ্চরণ 'মূর্খের দল', ফাইজুর রহমান মানির পাওনা টাকা আদায় না করে উল্টো তাকে সালাম জানিয়ে ফিরে এসে মন্তব্য করা, 'শালা ছ্যাচ্চোর!', পুরুষ গম্ভীরা দল ও স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রতি মহিলা গম্ভীরা শিল্পী ছাবিনা ইয়াসমিনের উক্তি, 'ভাই কী বলব', 'ওরা নিজেদের ঘরের মহিলার ইজ্জত করে না' ইত্যাদি সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরের প্রতিরোধের চিত্র।

কেন প্রতিরোধ করে

চিন্তা ও কাজের সমন্বিত প্রয়োগ হলো সচেতনতা। সচেতনতা প্রসঙ্গে দুটো বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া যায়- (১) কোনো প্রতিক্রিয়াহীন আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও কর্মহীন অবিচলিত অবস্থা, এবং (২) চালনাকারী। কাজের জন্ম হয় আকাঙ্ক্ষার বৃত্ত থেকে সচেতনতাকে জাগ্রত করতে এবং তখন থেকেই আকাঙ্ক্ষাও তদনুযায়ী কাজ করে থাকে। এ কারণে প্রতিরোধমূলক কোনো ক্রিয়া এবং প্রতিরোধের চিন্তা হল ক্রমাগত যোগাযোগ ও সংলাপের ফল (Scott, James C., 1985 : 38)। সরদার আ. লতিফ সরকারও তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় প্রতিনিয়তই যোগাযোগ করেছেন সরকার ও

বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির কর্তাব্যক্তির সঙ্গে, যদিও ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা তাঁর অন্তর্গত প্রতিরোধ স্পৃহারই বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবের বস্তুগত আচরণের জগতে আকাঙ্ক্ষা ও সচেতনতা একই সূত্রে গাঁথা নয়। আকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে একটি ধারাবাহিক কর্মধারা (Line of Action) অনুসরণ করতে হয় যেটা হয়তো এই মুহূর্তে অসম্ভব বলে মনে হয় (Scott, James C., 1985 : 38)। এ কারণে একজন মানুষ প্রতিরোধের স্বপ্ন দেখতে পারে। অন্যদিকে যেই অবস্থার পরিবর্তন হয় তা আসলে স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে সম্ভবপর হয়। 'Realm of Consciousness' – 'সচেতনতার উপলব্ধি' আমাদেরকে ধারাবাহিক কর্মধারার অগ্রাধিকার দেয় যা হয়তো ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে সুখকর হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সরদার আ. লতিফ সরকার ও ফাইজুর রহমান মানির দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে তাদের প্রতিরোধের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, সরদার আ. লতিফ সরকার যখন নিজ এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা গম্ভীরা গান পরিবেশনে বাধাগ্রস্ত হলেন, তখন তিনি নিজ এলাকার বাইরে গিয়ে গম্ভীরা পরিবেশনের কৌশল বেছে নিলেন। মসজিদে 'গজল' পরিবেশনের সময় আড়ালে বসে যারা কুৎসা করছিল তাদের প্রতি প্রতিরোধের তীর ছুঁড়ে দেন এই বলে, 'অপেক্ষায় রইলাম, সময় আসুক, তখন দেখা যাবে', যদিও তিনি কারও সাথেই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন না। নিম্নবর্গ হিসেবে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিজ অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিরোধের এসকল কৌশল যথেষ্ট বিচক্ষণতার দাবি রাখে।

প্রতিরোধ বলতেই আমরা মনে করি, উচ্চবর্গের প্রয়োগকৃত ক্ষমতার বিপরীতে নিম্নবর্গের প্রয়োগকৃত শক্তি হলো প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ কখনও কখনও সত্যকে আবিষ্কার করার উপায় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ফাইজুর রহমান মানি গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে প্রতিরোধের ক্ষেত্র রচনা করেন তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে। তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে গম্ভীরা গানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে, প্রকৃত চুক্তির বরাদ্দের পরিমাণ জানার দাবি করেন। তিনি মনে করেন, একজন গম্ভীরা শিল্পী হিসেবে এটা জানতে চাওয়ার অধিকার তাঁর আছে। গম্ভীরা গান পরিবেশনে দেখা যায়, গম্ভীরা শিল্পীদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে, চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি মাঠ পর্যায়ে পরিচালনার কারণে প্রকৃত সম্মানী থেকে শিল্পীরা বঞ্চিত হন। নিজের প্রকৃত অধিকার সংরক্ষণে ফাইজুর রহমান মানির এই উদ্যোগ উচ্চবর্গের হেজিমনির বিপরীতে নিম্নবর্গের প্রতিরোধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্ষমতার ব্যবহার শুধু দমন, নিপীড়নের জন্যই ব্যবহৃত হয় না বরং তা কখনও কখনও সত্য উদ্ধার বা আবিষ্কারের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। মিশেল ফুকো এ প্রসঙ্গে বলেন,

> Truth is a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of constraint. And it induces regular effects of power. Each society has its regime of truth, its `general politics' of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes

function as true; the mechanisms and instances which enable one to distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned; the techniques and procedures accorded value in the acquisition of truth; the status of those who are charged with saying what counts as true. (Foucault, in Rabinow 1991)

বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তিই ক্ষমতার বহিপ্রকাশ

ক্ষমতা অর্থ একের ওপর অন্যের বল প্রয়োগই নয়, নিজের প্রতিভা বিকাশের সামর্থ্যও ক্ষমতারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে নিত্যনতুন এবং বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তিই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যা শুধুমাত্র উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এ ক্ষমতা সাধারণ মানুষের। সমাজের নিচুতলার মানুষেরও হতে পারে। এ ক্ষমতার ওপর উচ্চবর্গের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ভোলাহাটের ইউএনও যখন ডেকে নিয়ে সরদার লুৎফর রহমান ও তাঁর দলের সাথে একান্ত পর্যায়ের বৈঠকে বসেন, তখন ইউএনওর বয়স জানতে চাওয়ার প্রসঙ্গে সরদার আ. লতিফ সরকারের উক্তি, 'স্যার আপনি আমাদের এখানে প্রত্যেকের চাইতে বয়সে ছোট হবেন', সুস্পষ্টভাবে তাদের অধিকার ও সম্মান প্রত্যাশার ইঙ্গিত করে। রাজশাহী সদরের বকুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফাইজুর রহমান মানি, ভোলাহাটের সরদার আ. লতিফ সরকার, এঁরা সকলেই জীবনে টিকে থাকার সংগ্রামে সমাজের উচ্চবর্গের সাথে আপস করেন এবং তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। একথাও স্বীকার করতে হয় যে, তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দ্বারা উচ্চবর্গের কাছ থেকে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট থেকেছেন (Scott, James C., 1985 : 41)। নিম্নবর্গের চিন্তায়ও অলীক রাষ্ট্রবাদ ওইরকম দোটানা এবং পরস্পর বিরোধী অর্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। একদিকে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বাস্তব ও চৈতন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও তজ্জনিত দুর্বলতার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ পরোক্ষভাবে তাদের টিকে থাকার ক্ষমতাকেই নির্দেশ করে (রণজিৎ গুহ, ২০০১ : ৪৬)। মিশেল ফুকোও এই মত সমর্থন করেন, 'ক্ষমতা শুধুমাত্র না-বোধক চিত্র প্রকাশের উৎস নয় বরং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকৃত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এবং ব্যক্তি তার জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা নিজেকে উৎপাদনমুখী করার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে (Foucault, 2001 : 194)। সরদার আ. লতিফ সরকার কর্তৃক ভোলাহাট উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট থেকে বাচ্চামারি হাইস্কুলের জন্য অনুদান সংগ্রহ, গম্ভীরা গানের মাধ্যমে বিরেশ্বরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজ দ্রুততর করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়কে কেন্দ্র করে উপজেলা ইউএনওকে তির্যক ব্যঙ্গ করা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে মহিলা গম্ভীরা দল হিসেবে ছাবিনা ইয়াসমিনের লড়াই, ফাইজুর রহমান মানির নিজ অধিকার সংরক্ষণকৌশল – এসবই জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও তার সফল

প্রয়োগের সন্নিবেশন মাত্র। গম্ভীরা শিল্পীদের এসকল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনারই বহিঃপ্রকাশ যা তাদেরকে আয়বর্ধকপদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

নিম্নবর্গীয় শ্রেণির সচেতনতা বিষয়ে মার্কসীয়তত্ত্বে যে সরল ব্যাখ্যা করা হয় তা মূলত অর্থনৈতিক বিষয় নির্ভর (Heywood, 1994 : 85)। পুঁজিবাদ আগে থেকেই দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণি; বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বের কথা ধরে নেয়। এক মেরুতে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি, যারা সকল সম্পদের, উৎপাদনের সকল উপায়ের মালিক। আর অন্য মেরুতে রয়েছে ব্যাপক দুস্থ ব্যক্তিদের সমষ্টি যাদের উৎপাদনের উপায় কিংবা জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়তই লড়াই করতে হয় বাস্তবতার সাথে (আনু মাহমুদ অনূদিত, মূল রচনা: এল. লিয়নতিয়েভ, ২০০৯ : ১০)। নিম্নবর্গীয় শ্রেণিচেতনার ধারণা মার্কসীয়তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকেও ছাড়িয়ে যায়। উপরের আলোচনায় দেখা যায়, শ্রেণিদ্বন্দ্ব শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্যই নয়, বরং টিকে থাকা বা আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। এই লড়াইয়ে ক্ষমতা কেবল এককভাবে উচ্চবর্গের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্ষমতা নিম্নবর্গের দ্বারাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তা কখনও কখনও উচ্চবর্গের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবেশনগত কারণে গম্ভীরা গানের সাথে আলকাপ গানের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও কৌশলের দিক থেকে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। আলকাপ গানের মধ্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি মন্তব্য ও সমালোচনা দেখতে পাওয়া গেলেও গম্ভীরা গানে তা অনেকাংশেই অনুপস্থিত দেখা যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গানের পরিবেশনা সর্বোচ্চ ১৫-২০ মিনিটের বেশি দেখা যায়নি। উপরন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু গান পরিবেশিত হয় তার সমস্ত অংশ জুড়েই থাকে উপস্থিত প্রধান অতিথির বন্দনা কাব্য এবং ভাড়ামিপূর্ণ ঠাট্টা-মস্করা। বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত গম্ভীরা বিষয়ক পুস্তকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত আন্দোলন ও প্রতিরোধ বিষয়ে মাত্র কয়েকটি গম্ভীরা গান ব্যতীত মাঠ পরিদর্শনে কোনো গম্ভীরা শিল্পীর কাছে কোনো বিষয়েই আন্দোলনের হাতিয়ার বা লড়াইয়ের মাধ্যম বা প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় – এরকম গম্ভীরা গানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এর কারণ পূর্বেই জানা গেছে, ফায়জুর রহমান মানি'র বক্তব্যে; গম্ভীরায় সরাসরি কোনোকিছুর সমালোচনা করা যায় না। যারা আগে গম্ভীরা করতেন, তাদের সময় গম্ভীরাতে প্রত্যক্ষ সমালোচনা করার সুযোগ ছিল। বর্তমান সমাজে সমালোচনা করতে হয় আকারে-ইঙ্গিতে। মহিলা গম্ভীরা শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনও অনুরূপ বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি জানান, গম্ভীরা গানের লিখিত যে রূপ থাকে তার মধ্যেও কারোও প্রতি সমালোচনামূলক কিছু লেখা থাকে না। আমরা লিখি না। কারণ লেখা থাকলে তার একটা প্রমাণ থেকে যায়। আমরা যা বলার তা মঞ্চের উপরে মৌখিকভাবে সরাসরি বলি। কৌতুকের ছলে পরিবেশন করি। যে বুঝার সে ঠিকই বুঝতে পারে। এসকল কারণে, গম্ভীরা গানে উচ্চবর্গের মতাদর্শিক আধিপত্য এবং

নিম্নবর্গের প্রতিরোধের চিত্র অন্বেষণে গম্ভীরা শিল্পীদের সমাজ, আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়েছে।

গম্ভীরা গানের দীনতা

গম্ভীরা গানের দৈন্য প্রসঙ্গে পূর্বসূরি অনেক গবেষক তাঁদের অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানগর্ভ মতামত রেখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসকল মতামতের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন – গম্ভীরা গানের সুরের বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়েমি, ঘটনার দৈন্য, সর্বদাই সমালোচনার মনোভাব এই গম্ভীরা গানকে একটা সীমিত গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৩৯)।

এদেশের শিক্ষিত সমাজ বিভিন্ন বিধি-নির্দেশ ও প্রকরণের দ্বারা গম্ভীরা গানকে তার সাবলীল প্রকাশভঙ্গি থেকে সীমাবদ্ধ করে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। যেমন– মাযহারুল ইসলাম তরু গম্ভীরা গানের বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করেন, 'বর্তমানে কিছু কিছু ধর্মীয় উৎসবে ধর্মীয় অনুভূতি প্রসূত কিছু গান পরিবেশিত হলেও তা নৈবেদ্য সূচক নয়, ধর্মীয় বিধান নিদের্শক' (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ১০৬)। যদিও রাজশাহী সদরের দুটি গম্ভীরা দল এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর এবং রহনপুরের মোট আটটি গম্ভীরা দলের শিল্পীদের সাথে আলোচনা করে কোথাও ধর্মীয় বিধান নির্দেশক কোনো গম্ভীরা গানের হদিস এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি মাযহারুল ইসলাম তরু তাঁর উল্লিখিত উক্তির স্বপক্ষে কোনো দৃষ্টান্তও তুলে ধরেননি। প্রসঙ্গত বলা যায়, মাযহারুল ইসলাম তরু 'ধর্মীয় বিধান নির্দেশক' বলতে কোন্ ধর্মের বিধান নির্দেশক অথবা কোন্ ধর্মের 'নৈবেদ্য' বলতে চেয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়।

তাসাদ্দক আহ্‌মদের রচনায় সচেতন ও শিক্ষিত পণ্ডিত বর্গের প্রতি তাঁর আকুল আবেদন প্রকাশ পেয়েছে : 'কিন্তু খুব সম্প্রতি কোনো কোনো দল শাসক শ্রেণির স্তুতিমূলক গম্ভীরা পরিবেশন করায় গম্ভীরা গান তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটা স্খলিত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সচেতন ও শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজ সচেষ্ট না হলে হয়ত আমাদের এই নবাবগঞ্জ জেলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা একদিন অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মতো কালের গতিচক্রে খেই হারিয়ে ফেলবে – তাতে বিচিত্র কি?' (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ১৫৪)।

আইহোর কবি প্রয়াত ইন্দ্রদমন শেঠ দুঃখ করে বলেছিলেন, 'গায়কের অভাবে গান গাওয়ান হয় না। খাতার গান খাতায় লেখা থাকে। নতুন নতুন গায়কের জন্ম না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত গম্ভীরা গান গাওয়ানোই হবে না' (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৫১)। গম্ভীরা গানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অতি জরুরি। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের সঙ্গে গম্ভীরা গানের একটি সংযোগ থাকে তবে সে ধর্ম লোকধর্ম। তাই লোকসমাজের গানই গম্ভীরার গান। গ্রামের সাধারণ মানুষই গম্ভীরা গানের রচয়িতা, পরিচালক, শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক এবং রসগ্রাহী শ্রোতা (পুলকেন্দু সিংহ, ২০০৮ : ৭৮)।

গম্ভীরা শিল্পী বনাম রচয়িতা

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত উঁচু তলার মানুষ পেছন থেকে গম্ভীরার শিল্পীদের মুখ দিয়ে তথ্য সম্মৃদ্ধ সমালোচনামূলক গানগুলো প্রকাশ করতেন। মূলত এসকল মানুষ ছিলেন গম্ভীরার মাথা আর সাধারণ মানুষের কাতারের গম্ভীরা শিল্পীরা ছিলেন গম্ভীরার 'মুখ'। কেননা, এদেশের শিক্ষিত সমাজই এই সর্ব সাধারণ মানুষের বেশে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সরকারের ঘোর সমালোচনা করে থাকেন (প্রদ্যোত ঘোষ, ২০০৮ : ৩৬)। গম্ভীরা গানের রচয়িতারা এবং গম্ভীরা গানের শিল্পীরা সমশ্রেণিভুক্ত ছিলেন না – এর প্রমাণ পাওয়া যায় অধ্যাপক মুহম্মদ এলতাস উদ্দিনের 'গম্ভীরা গানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' শীর্ষক রচনায়। তিনি উল্লেখ করেন, 'গম্ভীরা গানের রচয়িতারা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। নবাবগঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়েছে। গম্ভীরা গান ব্যতিরেকে স্কুল কলেজের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই যেন জমতো না। এই গম্ভীরা গানগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রচনা করতেন হরিমোহন হাই স্কুলের শিক্ষক জনাব লুতফুল হক (লুথু মিয়া) এবং সুর দিতেন নাইমুল মাস্টার' (মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, ১৯৮১ : ৩৯)। অর্থাৎ, গম্ভীরা গানে যে কথাগুলো ব্যক্ত হয় সে কথাগুলো গম্ভীরা শিল্পীদের নিজস্ব কথা নয়। এ যেন অন্যের কথা তোতা পাখির মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে – ঠিক এমন। সমাজের যে শ্রেণি বা যারা গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন এবং যারা গম্ভীরা গানের রচয়িতা তারা সমশ্রেণিভুক্ত নয়। গম্ভীরা গানের শিল্পীদের থেকে গম্ভীরা গানের রচয়িতাদের সামাজিক অবস্থান অপেক্ষাকৃত উন্নত। তিনি যা কিছু রচনা করেন তা তার দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট। এর ফলে দেখা যায়, সমাজের নিম্নবর্গীয় গম্ভীরা গানের শিল্পীরা শুরু থেকেই সমাজের উচ্চবর্গীয় গম্ভীরা রচয়িতাদের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা যেভাবে সমাজকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, গম্ভীরা গানের শিল্পীরা সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। গম্ভীরা রচনাকারী উচ্চবর্গীয় শ্রেণি যেভাবে গম্ভীরাকে দেখতে চেয়েছেন তারা ঠিক সেভাবেই গম্ভীরাকে চালিয়েছেন। বলা যায়, গম্ভীরা গানের শিল্পীরা কখনওই মুক্ত বিহঙ্গের মতো মুক্ত আকাশে নিজেদের ডানা মেলতে পারেননি।

গম্ভীরার দীনতার কারণ হিসেবে আপাতদৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো চিহ্নিত হয়, তা মূলত শ্রেণিচেতনার কয়েকটি বিশেষ দিক। যেমন, গম্ভীরা গানে পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের কথাগুলো উঠে আসে না। প্রকৃত চিত্র হল, সাধারণ মানুষগুলোর মুখ দিয়ে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণি তাদের কথা বলায়। গম্ভীরা গানের সাথে যারা যুক্ত তারা প্রান্তিক বা নিচু তলার পিছিয়ে পড়া সহজ সরল মানুষ নয়। বরং তারা শিক্ষিত, অনেকে উচ্চ শিক্ষিত। এসকল শিক্ষিত লোকের হাতে গম্ভীরা অনেকাংশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিপুষ্ট একটি মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেখা গেছে, গম্ভীরা লোকাচার থেকে যতই দূরে সরে গেছে, ততোই তা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কাছে চলে এসেছে। এভাবে ধীরে ধীরে গম্ভীরা গান সময় ও পরিবেশনার দিক থেকে সংস্কুচিত হতে হতে একসময়ে সমাজ থেকে হারিয়ে যাবে – এমন আশঙ্কা করা খুবই যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার

উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের অবকাঠামোহীন এসকল প্রতিরোধ ছোট ছোট এক-একটা সামাজিক মুভমেন্টের মতো। এগুলো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাহীন নেতৃত্ব – দিকনির্দেশনাহীন কোনো নাম, কোনো ব্যানারবিহীন সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু সফল মুভমেন্ট। এগুলো কোনো খবরের পাতায় আসে না; অগোছালোভাবে যত্রতত্রভাবে এগুলো সংগঠিত হয়। প্রবালপাথর গঠনের মতো নিয়ন্ত্রণহীন এদের গতিপ্রকৃতি। ব্যক্তিপর্যায়ের নিম্নবর্গকেন্দ্রিক প্রতিরোধ এবং ক্ষতিকারক ক্রিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা সৃষ্টির জন্য নিজেদের মতো করে সংগঠিত হয়। তাঁদের কাজের প্রকৃতি ও স্বার্থের কারণে তাঁরা চুপ থাকেন ফলে সৃষ্টি করে চলে নিঃশব্দের প্রতিরোধ। বেশিরভাগ নিম্নবর্গীয় শ্রেণির একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তাহল, নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী উচ্চবর্গ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই একমাত্র প্রতিরোধের পন্থা।

গম্ভীরা গান সুশীল সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে সম্প্রদায় গম্ভীরা গানকে তাঁদের মূল্যবোধের জন্য অন্তরায় মনে করে, স্থানীয়ভাবে উচ্চবর্গ হিসেবে তাঁরা সুশীলসমাজকে তাঁদের মতাদর্শ অনুরসরণ করতে বাধ্য করে। এই বাধ্যকরণের প্রক্রিয়া মানসিক প্রক্রিয়া। গম্ভীরা বিষয়ে সুশীল সমাজের ওই সকল প্রতিনিধি যে কোনো কারণেই হোক তাঁদের সমাজিক সত্তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এই সুশীলসমাজ গম্ভীরা গানকে সরাসরি নিরুৎসাহিত করে না কিন্তু গানের শিল্পীদেরকে এমন ধরনের কাজের ক্ষেত্র নির্মাণ করে দেয় যার ফলে গম্ভীরা চর্চা করা ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ত সময় ও পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। যেমন – বর্তমানে গম্ভীরা পরিবেশনার পরিধি পনের মিনিটে এসে ঠেকেছে, যা পূর্বে দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে পরিবেশিত হত। গবেষণা অনুসন্ধানে দেখা যায়, গত দুই বছর ধরে আম মৌসুমে গম্ভীরা গানের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। পূর্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর পক্ষ থেকে গম্ভীরা গান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। বর্তমানে সেই উদ্যোগও বন্ধ আছে। তাই এক্ষেত্রে জোর দিয়েই বলা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে গম্ভীরা বিষয়ে অভিজ্ঞ সুশীলসমাজের আগ্রহই গম্ভীরার ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারে। জাতীয় পর্যায়ের আইন বা অনুদান হয়তো কিছু সময়ের জন্য সচল করতে পারে মরচে-ধরা গম্ভীরার কর্মকাণ্ডকে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তা খুব সামান্যই সুফল বয়ে আনতে পারে।

গম্ভীরা গানে উচ্চবর্গের মতাদর্শিক আধিপত্য বা হেজিমনি কোনো প্রত্যক্ষ বা সরল প্রক্রিয়া নয়। একইভাবে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ বিষয়টিও অত্যন্ত জটিল এবং সকলের অগোচরে বা পরোক্ষভাবে সংগঠিত হয়। উচ্চবর্গের হেজিমনি এবং নিম্নবর্গের প্রতিরোধের বিষয় অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও তাঁদের সাথে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় গভীর এবং অন্তরঙ্গভাবে মিশে যখন অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা হয় তখন তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার

বিষয়গুলো উন্মোচিত হয়। তাঁদের এই অভিজ্ঞতাগুলো গবেষণার অনুলিপি ('ট্রান্সক্রিপ্ট') আকারে নিবন্ধিত হয়েছে। দেখা গেছে, উচ্চবর্গের হেজিমনি প্রকৃতপক্ষে একটি মানসিক বা চিন্তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। তাই এই প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটা ব্যক্তির স্বার্থ উদ্ধারের কৌশল হিসেবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে প্রয়োগ করা হয়। গবেষণা প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, বাস্তবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উচ্চবর্গ বিচিত্র উপায়ে নিম্নবর্গের প্রতি এই প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করে থাকে। অপরদিকে, নিম্নবর্গের প্রতিরোধ-প্রক্রিয়াগুলো দীর্ঘ পরিকল্পনার প্রক্রিয়াজাত উপাদান নয় বরং তা বিভিন্ন প্রতীক, অঙ্গভঙ্গি ও শব্দের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া – যা প্রাত্যহিক জীবনের একেবারে ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়।

টীকা

১. মোট ঘর ১৩০টি, মোট জনসংখ্যা ৭৪১, শিক্ষার হার, ৪৪.৬৯% (পৃ. ৩৬) এবং গৃহস্থালী কাজের সাথে যুক্ত ১৬২, কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ৫০০ জন, এবং ব্যবসায়ী ৫ জন। (Muhammed A. Malik (editor), *Population Cencus-2001, Community Series, Zila-Nawabganj,* Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka: Plannig Division, Ministry of Planning, Published in April 2005), pg. 122

গ্রন্থপঞ্জি

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (২০০১)। *মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

অভিজিৎ চক্রবর্তী (২০০২)। *মিশেল ফুকো : রক্তকরবী*, কলকাতা

আখতার সোবাহান খান (২০০৮)। *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরাতার ধারণা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আখলাকুর রহমান (২০১১)। *মার্কসীয় অর্থনীতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আনিসুর রহমান (১৯৯২)। *উন্নয়ন জিজ্ঞাসা*, ব্র্যাক, নভেম্বর ১৯৯২, ঢাকা

আবুল কালাম শেখনূর মোহাম্মদ (২০০৭)। *নবাবগঞ্জ পরিচিতি [চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ইতিহাস]*, (সম্পা. ড. তসিকুল ইসলাম), গতিধারা, ঢাকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬২)। *বাংলার লোকসাহিত্য* (১ম খণ্ড), ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা

ইয়েনেকা আরেন্স, ইওসফান ব্যুরদেন (১৯৮০)। *ঝগড়াপুর : গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী*, (বাংলা রূপান্তর : নিলুফার মতিন), গণপ্রকাশনী, ধামরাই, ঢাকা

এল. লিয়নতিয়েভ (২০০৯)। *মার্কসীয় অর্থনীতির মূলসূত্র*, (অনুবাদ : আনু মাহমুদ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

এস. এম. আব্দুল লতিফ (১৩৯৪)। *জনপ্রিয় সঙ্গীত গম্ভীরা* (স্মরণিকা : বৈশাখী মেলা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ওয়াকিল আহমদ (২০১৪)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা

কাজী মোহাম্মদ মিছের (২০০৭)। *রাজশাহীর ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড*, (সম্পা. ড. তসিকুল ইসলাম), গতিধারা, ঢাকা

কালীনাথ চৌধুরী (২০০৭)। *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রাজশাহী পরিচিতি*, {(সম্পা. ড. তসিকুল ইসলাম), গতিধারা, ঢাকা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯৭২)। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, কলিকাতা

তসাদ্দক আহমদ (১৯৯৪)। *নবাবগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত গম্ভীরা*, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা

মাসুদুল হক (২০০৮)। *দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার*, গতিধারা, ঢাকা

মোহাম্মদ হাননান (১৯৯৪)। *বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব*, বাংলাএকাডেমি, ঢাকা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০০)। *ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত : গ্রামশি ও মিশেলফুকো, আনাতোলি ও গ্রামশি : বিচার বিশ্লেষণ (২য় খণ্ড)*,সম্পা. শোভনলাল দত্ত গুপ্ত

প্রদ্যোত ঘোষ (১৯৬৯)। *গম্ভীরা, লোকসঙ্গীত ও উৎসব, একাল ও সেকাল*, কলকাতা

প্রদ্যোত ঘোষ (১৩৮৯)। *লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

প্রদ্যোত ঘোষ (২০০৪)। *মালদহ জেলারইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণীসংগ্রাম* (অনুবাদ : ডালেম চন্দ্র বর্মণ, সুরাইয়া বেগম), সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র (ঢাকা

মামুন অর রশীদ (২০০৯)। *উত্তর আধুনিকতা উপনিবেশিকতা নিম্নবর্গ*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

মাযহারুল ইসলাম তরু (১৯৯০)। *জেলা নবাবগঞ্জের ইতিকথা*, রহিম বুক ডিপো, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

মাযহারুল ইসলাম তরু (১৯৯৯)। *চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পা. (২০০৮)। *হাজার বছরের গম্ভীরা*, গতিধারা, ঢাকা

মাযহারুল ইসলাম তরু (২০০৫)। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মিল্টন বিশ্বাস (২০০৯)। *নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বরূপ ও পরিসর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলাএকাডেমি, ঢাকা

রতন খাসনবিশ সম্পা. (২০০৯)। 'মার্কসবাদ ও উত্তর-আধুনিকতা,'*উত্তর-আধুনিকতা ও মার্কসবাদ*

রণজিৎ গুহ (২০০১)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদিত : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, কলিকাতা

সালাউদ্দিন আইয়ুব (১৯৯৯)। 'সাবল্টার্ন ইতিহাস জিজ্ঞাসা', *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী (১৯৯৯)। *উত্তর আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রতিভাস, কলকাতা

সুবোধ সেন ২০০২)। *উত্তর বঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন*, পশ্চিমবঙ্গ : লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, সরকার, কলকাতা

সেলিম আল দীন (১৯৮৬)। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হরিদাস পালিত (২০০৩)। *আদ্যের গম্ভীরা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা

সহায়কগ্রন্থ : ইংরেজি

Ashraf Siddiqui (1997), *Bengali Folklore: Collections and Studies*, Bangla Academy, Dhaka

Ashraf Siddiqui (2004), *Folkloric Bangladesh*, Bangla Academy, Dhaka

Antonio Gramsci (1996), *Selections from Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and GeofreyNowell Smith, Orient Longman Private Ltd., Chennai

Bill Ashcroft (2004), *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, Edited by Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Routledge, London

Donna Landry and Gerald Maclean (edited 1996), *Selected works of Gayatri Chakravarty Spivak,* Routledge, London and New York

David Hardiman (Edited 1993), *Peasant Resistance In India 1858-1914*, Oxford University Press, Delhi

David Hardiman (Edited 1981), *Peasant Nationalists Of Gujrat Kheda District 1917-1934*, Calcutta Madras: Oxford University Press, Bombay

Eric Laurier (2008), *Qualitative Research Methods: Participants Observation*, Department of Geography and Topographic Science, University of Glasgow, Scotland, UK

Ernest Mandel (1977), *From Class Society to Communism : an introduction to marxism*, translated by Louisa Sadler, Ink Links Ltd., London

F. H. Abed (1990), *Peasant Perception,* VOL 2 Law, Rural Study Series: 04, BRAC, Dhaka

M. Fazlur Rahman (2005), *Bangladesh Population Census-2001: of Community Series*, Zila: Nawabganj, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka

M. Fazlur Rahman (2005), *Bangladesh Agriculture Census-2005: of Master Survey of Agriculture*, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka

Gayatri Chakravorty Spivak (1994), *TheSpivak Reader*, Columbia University Press, New York

Gayatri Chakravorty Spivak (1994), *Colonial Discorse and Post-colonial Theory: A Reader*, edited and introduced by VinayakChaturvedi, Columbia University Press, New York

Gayatri Chakravorty Spivak (2003), *Lesbian rule, cultural criticism and the value of desire,* Duke University Press, Cornell University, USA

Henry Bergson (1911), *Laughter: An essay on the meaning of the comic*, Macmillan, London

Hira Singh (1998), *Colonial Hegemony and Popular Resistance*, Canadian Scholars' Press, Inc., Canada

James C. Scott (1985), *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University Press, New Haven

James C. Scott (1990), *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, Yale University Press, New Haven

Jon Elster (1991), *Making Sense of Marx*, Cambridge University Press, Paris

Lal Behari Day (1926) *Bengal Peasant life*, Macmillan And Co. Ltd., London

Linda Hutcheon (2002), *The Politics of Postmodernism*, Routledge, London

Michael Foucault (2001), *Power*, Penguin Books, London

Michael Foucault (1993), *Discipline & Punish*, Translated by Alan Sheridan, Vintage Books, New York

Michael Foucault (1990), *The History of Sexuality: An Introduction, Volume 1*, Translated by Robert Hurley,Vintage Books, New York

Michael Foucault (1991), *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault's Thought*, Edited by Paul Rabinow, Penguin Books, Toronto

Michael Foucault (1994), *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception*, Translated by A.M. Sheridan Smith, Vintage Books, New York

Michael Foucault (2005), *The Archaeology of Knowledge*, Translated by A.M. Sheridan Smith, Penguine Books, New York and London

Muhammed A. Malik (2005), *Population Census-2001: Community Series, Zila: Nawabganj,* Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Dhaka

Niaz Zaman, Ferdous Azim & Shawkat Hussain (1999), *Colonial and Post-Colonial Encounters*, University Press Limited, Dhaka

Nico Carpentier and Bart Cammaerts (2002), *Hegemony, Democracy, Agonism And Journalism, An interview with Chantal Mouffe,* University of Westminster, UK

Paul Strathern (1996), *Nietzsche In 90 Minutes, Ivan R. Dee,* Chicago

Ranajit Guha (2002), *Elementary Aspects of Peasant Insurgency In Colonial India*, Oxford University Press, Delhi

Ranajit Guha (2002), *History and Power in Colonial India*, Oxford University Press, Delhi

Ranajit Guha (2002), *Subaltern Studies I*, Oxford University Press, Delhi

Ranajit Guha (2002), *Subaltern Studies III*, Oxford University Press, New York

Ranajit Guha (1987), *Subaltern Studies V*, Oxford University Press, Delhi

Ranajit Guha (1987), *Subaltern Studies VII*, Oxford University Press, Delhi

Rustom Bharucha (2000), *The Politics of Cultural Practice: Thinking Through Theatre In an*

Age of Globalization, TheAthlone Press, London

Shumit Sarker (1997), *The Decline of the Subaltern, Writing Social History*, Oxford University Press, Delhi

Stephen Edgel (1993), *Class*, Routledge, London and New York

Tom Brass (2000), *Peasants, Populism and Postmodernism: Frank Class*, Portland OR, London

V. Joseph Femia (1988), *Gramsci's Political Thought, Hegemony, Consciousness and the Revolutionary Process*, Clarenden Press Oxford, UK

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : গম্ভীরা

মো. মনোয়ারুল ইসলাম বকুল, মাথুল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বোয়ালিয়া থানার মোড়, রাজশাহী সদর, ০৬-০৭ জুলাই, ২০১৩

খায়রুল আলম, হরিপুর, চাঁপাইবনবাগঞ্জ সদর, ৪-৫ জুলাই, ২০১৩

ছাবিনা ইয়াসমীন ও তাঁর দল, সরকারি মহিলা কলেজ রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ০২ জুলাই, ২০১৩

ফাইজুর রহমান মানি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ১২-১৩ আগস্ট, ২০১৩

রিপন ও তাঁর দল, রহনপুর, বুড়িতলা, ১০ জুলাই ২০১৩

লতিফ সরদার, কুমিরজান, ভোলাহাট, ১-১০ অক্টোবর, ২০১২

শাহজামাল আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ০৩ জুলাই, ২০১৩

শিষ মোহাম্মদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ০৮ জুলাই, ২০১৩

সঞ্জয় ও তাঁর দল, পালশা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১১ জুলাই, ২০১৩

স্বপন সরকার, খাসেরহাট বাজার, কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১৮ আগস্ট, ২০১৩